জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির অনিয়মিত সংবাদ বুলেটিন

বুলেটিন নং—৪, ১ম বর্ষ, রবিবার ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ ইং

মারিশ্যা বাজারে জুম্মদের উপর নগ্ন হামলা

বাংলাদেশের বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে "গণতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজমান" বলে দাবী করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ প্রতিনিয়ত সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর ধরপাকড়, নির্যাতন, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের শিকার হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে জুম্ম অধ্যুষিত বাঘাইছড়ি উপজেলায় (কাচালং) এ নির্যাতনের মাত্রা আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেখানে একদিকে সেনাবাহিনীর নির্যাতন অভিযান, অন্যদিকে মুসলমান বাঙ্গালীদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জুম্ম জনগণের জীবনযাত্রাকে চরমভাবে ব্যাহত করেছে। গত ২১শে আগষ্ট তারিখে মারিশ্যা বাজারে (কাচালং) জুম্মদের উপর ভিডিপি ও মুসলমান বাঙ্গালীদের সাম্প্রদায়িক হামলা এরই প্রতিফলন। এই হামলায় অর্ধ শতাধিক জুম্ম হতাহত ও লুন্ঠিত হয়। নিম্নে সাম্প্রদায়িক হামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া গেল।

রাঙ্গামাটি জেলার উত্তর পূর্বে সবচেয়ে জুম্ম অধ্যুষিত বাঘাইছড়ি উপজেলা অবস্থিত। এই উপজেলাটি মূলত: কাচালং বা মারিশ্যা নামে সমধিক পরিচিত। উপজেলাটি জুম্ম প্রধান অঞ্চল হলেও উপজেলা হেডকোয়ার্টারটি সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী মুসলমানদের নিয়ন্ত্রনে। এখানে মারিশ্যা জোন বিডিআর হেডকোয়ার্টার, ১টি আর্মি ক্যাম্প, একটি আনসার ক্যাম্প, ১টি থানা আছে এবং কয়েক শত ভিডিপি সহ দু হাজারের মত সামরিক ও আধা সামরিক সশস্ত্র বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। উপজেলা হেডকোয়ার্টারের মারিশ্যা বাজারটি কাচালং নদীর পশ্চিম কুলে অবস্থিত। বাজারের চারিপার্শ্বে বাঙ্গালী মুসলমানদের বসতি ও সশস্ত্র বাহিনীর

পঁয়ত্রিশ পাতায়

জেনেভা সম্মেলনে জুম্ম প্রতিনিধি দল

গত ২২শে জুলাই হতে ২রা আগষ্টে অনুষ্ঠিত আদিবাসী ওয়ার্কিং গ্রুপের জেনেভাস্থ নবম সম্মেলনে ৩জনের এক জুম্ম প্রতিনিধি দল অংশ গ্রহণ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুসৃত জুম্ম উচ্ছেদমূলক সরকারী নীতির বিশ্লেষণ করেন।

এই সম্মেলনে ২৯শে জুলাই তারিখে এক লিখিত বিবৃতিতে জুম্ম প্রতিনিধিগণ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের অনুসন্ধানের রিপোর্ট মূলে সেখানকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের সকল অভিযোগ সত্য বলে প্রমানিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগন তাদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের জন্য কমিশনের নিকট চির কৃতজ্ঞ এবং কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত সুপারিশ মালা সমূহ পূরণ করা হলে তাদের দুর্দশার অনেকটা পূরণ হবে বলে জুম্ম জনগন মনে করে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বর্তমান সরকারের প্রতি পূর্বতন সরকারের নীতি অব্যাহত রাখার অভিযোগ করে প্রতিনিধিবৃন্দ বলেন, জেনারেল এরশাদের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক ও বর্তমান বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্বতন এরশাদ সরকারের গৃহীত নীতি অব্যাহত রেখেছেন। যেহেতু বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় জেলা পরিষদ বাতিল করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা পরিষদ বাতিল করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের বৈধ করা ও জুম্ম জনগনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষাকারী ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিকে বাতিল করে এই জেলা পরিষদ জনগনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গঠন করা হয়েছিল।

পঁয়ত্রিশ পাতায়

জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

সম্পাদকীয়

১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলার সাধারণ মানুষের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও বাংলাদেশের ক্ষমতার রাজনীতিতে অনেক রাজনৈতিক নেতার উত্থানপতন, হত্যা-অপসারণ ইত্যাদি নাটকীয় পট পরিবর্তন দেখে আসছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক এই পট পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যায় বাঙ্গালী জাতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ১৯৮০ সালের প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যা সারা বাঙ্গালী জাতিকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তারপর, ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আবার প্রত্যক্ষ করে প্রেসিডেন্ট আব্দুল সাত্তারের অপসারণ ও স্বৈরাচারী এরশাদের ক্ষমতারোহন। দীর্ঘ ৯ বৎসর স্বেচ্ছাচারীভাবে দেশ শাসনের পর বাংলাদেশের সংগ্রামী ছাত্র শিক্ষক, শ্রমিক-জনতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবিদের দুর্বার আন্দোলনের মুখে গত বৎসরের ডিসেম্বরে এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের আপামর জনতার বিজয় সূচিত হয়। সকল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক-জনতার মনোনীত বিচারপতি শাহাবুদ্দীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দেশ চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আকাঙ্খা পুরণের জন্য গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত করেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অবাধ, ও সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন জনগণের রায়ে বি. এন.পি. দল আজ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই বি,এন পি সরকারই বাংলাদেশে সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার বলে স্বীকৃত।

কিন্তু বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভাগ্যে কোন পরিবর্তন এসেছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষেপে দেয়া যায় না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সারা বাংলাদেশে যে দুর্যোগ, অরাজকতা, রক্তপাত, হত্যা ইত্যাদি বিভীষিকার অধ্যায় সুচনা করে স্বাধীনতার পর বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যাকাশে সেই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রাককালে পার্বত্য চট্টগ্রামের যেনোও পানছড়িতে জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার নিপীড়ন, ধর্ষন, অগ্নিসংযোগ, হত্যার মত যে দুর্যোগ নেমে আসে তা আজও অব্যাহত রয়েছে। এমনকি উপরে আলোচিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার এত সব পট পরিবর্তনেও জুম্ম জনগণের সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন আসেনি। ১৯৭১-৭৫ এর মুজিব শাসনামলে মুক্তি ও বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত বৃহৎ বাঙ্গালী জাত্যাভিমানে গর্বিত মুজিব সরকার জুম্ম জনগণের সব স্বকীয়তা, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশের সুচনা করে। সাথে সাথে চলতে থাকে নির্যাতন, ধর্ষন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তর প্রভৃতি নারকীয় কার্যকলাপ

এরপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন প্রেসিডেন্ট জিয়া। ১৯৭৬—৮১ ইং এ সময়েও জুম্ম জনগণের উপর পূর্বতন সরকারের অনুসৃত পলিসির কোন পরিবর্তন হয়নি বরঞ্চ পূর্ব গৃহীত ঘৃন্য কার্যকলাপ, পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন করা হয় আরো সুদৃঢ়ভাবে। ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়া শুরু করেন পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী বহিরাগতদের পুনর্বাসন, ভূমি বেদখল, শান্তিবাহিনী দমনের নামে অত্যাচার, অবিচার, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষন, গণহত্যা ও জুম্ম উচ্ছেদ অভিযান। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হলেও তার গৃহীত পরিকল্পনা বাতিল ও স্থগিত হয়ে থেমে থাকেনি ১৯৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতায় এলে আরো পুরোদমে শুরু হয় লক্ষ লক্ষ বহিরাগতদের পুনর্বাসন, ভূমিবেদখল, অগ্নি সংযোগ ও গণহত্যার মাধ্যমে জুম্ম জনগণের উচ্ছেদ কার্যক্রম। সৈরাচারী এরশাদের ১৯৮২—৯০ এর আমলই ছিল জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ক্রান্তিলগ্ন। তার আমলে সংঘটিত হয়েছে ভূ নছড়া ১৯৮৪), পানছড়ি (১৯৮৬), চংড়াছড়ি (১৯৮৬) বাঘা ছড়ি (১৯৮৮ ও লংগদু (১৯৮৯) গণহত্যা, ৫ লক্ষ বহিরাগতকে জুম্মদের জমিতে পুনর্বাসন, ৭০ হাজার জুম্ম জনগণের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ, অগণতান্ত্রিক ও গণবিকৃত পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন ও বাস্তবায়ন।

তাই দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব (১৯৭১-১৯৭৫) প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (১৯৭৬—১৯৮১) ও জেনারেল এরশাদ (১৯৮২—১৯৯০) প্রতিটি সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রামে এক পলিসি গ্রহণ, অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করে এসেছেন। মুজিব সরকারের গৃহীত পলিসি জিয়া সরকার এবং জিয়া সরকারের পলিসি এরশাদ সরকার অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করে এসেছেন। পূর্বতন সরকারগুলোর এই অনমনীয় ও অপরিবর্তনীয় একই জুম্ম বিরোধী নীতি গ্রহণও অনুসরনের আলোকে আজ জুম্ম জনগণের

চৌত্রিশ পাতায়

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সকাশে মিজোরামের চাকমা নেতৃবৃন্দ

নয়াদিল্লী, ২রা আগষ্ট। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রিত জুম্মা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পি, ভি, নরসীমা রাও । গতকাল মিজোরামের একজন মন্ত্রীসহ চারজন চাকমা নেতৃবৃন্দ জুম্ম শরণার্থীদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষন করলে প্রধানমন্ত্রী চাকমা নেতৃবৃন্দকে এ আশ্বাস প্রদান করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের সমস্যার ব্যাপারে তাঁর গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

চৌত্রিশ পাতায়

জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ওসমানির বিবৃতির প্রত্যুত্তর

জেনেভাতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের (IWGIA) নবম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সহকারে বাংলাদেশ প্রতিনিধি এক লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। এ বিবৃতির প্রত্যুত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনও এক লিখিত বিবৃতি প্রদান করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, এ অধিবেশনে লেইফ ডানফজেলড (Leif Dunfjeld) তাঁর ভাষনে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের গঠন এবং এর গবেষণা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন । এতে আরো বলা হয়, কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কমিশনের সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না । যেহেতু আন্তর্জাতিক আইন ও রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে কমিশন গঠিত। তাছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস ও জাতিগত বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে রিপোর্টের বিষয়াবলী তুলে ধরা হয়েছে। তা সত্বেও কমিশন নিম্নের আরো তিনটি বিষয় তুলে ধরেছে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী বিষয়ক সংস্থার (IWGIA) অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিনিধির ভুল ধারনা রয়েছে। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক কমিশন এবং উক্ত সংস্থার অংশ নয়।

(২) বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা উল্লেখিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ কয়েকটি সংস্থার পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর সম্বন্ধে

বত্রিশ পাতায়

জেনেভাস্থ সম্মেলনে বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধির বিবৃতি

গত ২২শে জুলাই হতে ২রা আগষ্ট তারিখে জেনেভাতে জাতিসংঘের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মানবাধিকার কমিশন এর বৈষম্য নিবারণ ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা সাব-কমিশনের উদ্যোগে আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের (**United Nation's Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities Working Group of Indigenous Population**) নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে বাংলাদেশের জেনেভাস্থ স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাফলে আর ওসমানি বিভিন্ন ব্যক্তি ও গ্রুপ কর্তৃক উত্থাপিত বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এক লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি এই বিবৃতিতে ওয়ার্কিং গ্রুপের নিকট উত্থাপিত (১) বাংলাদেশে আদিবাসীদের মর্যাদা (২) পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ (৩) ২৯-৭-৯১ ইং তারিখে ডঃ আর, এস, দেওয়ান সহ তিন জন জুম্মের উত্থাপিত জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগকে বাস্তবে অসত্য, ভিত্তিহীন, বিদ্বেষ প্রসূত ও রাজনৈতিক ভাবে প্ররোচিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, ঐতিহাসিক ও জাতিগত ভাবে বাংলাদেশের ১১ কোটি লোক সবাই বাংলাদেশের আদিবাসী। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও আমরা এক জাতি। (Historically and Ethnically all the 11 million people are 'Indigenous' people. We are one and

বত্রিশ পাতায়

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পাহাড়ী ছাত্র সমাজ

বস্তুত একটি দেশ ও জাতির স্বাধীকার আদায়ে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ছাত্রসমাজ নির্লিপ্ত ও নিশ্চুপ থাকতে পারে না। দেশ ও জাতির স্বার্থে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হয়। এ ক্ষেত্রে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র সমাজও পিছিয়ে নেই। জুম্ম জাতির ক্রান্তিলগ্নে জুম্ম ছাত্রসমাজও এগিয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, জুম্ম জাতির ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সাল থেকে অদ্যাবধি জুম্ম ছাত্র সমাজ-এ ঐতিহাসিক দায় দায়িত্ব পালন করে আসছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জুম্ম জনগণের উপর যখন অত্যাচার নিপীড়ণ নেমে আসে তখন পাহাড়ী ছাত্র সমিতি তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিল। সকল রকম জাতি নিপড়ণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বিগত '৮০-এর দশকে এ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে ঢাকা ভিত্তিক পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ।

বিগত ১৯৮৯ সালের লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিনিধিত্ব করার দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতির মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ। জন্মলগ্ন থেকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবীসহ সার্বজনীন বিজ্ঞান ভিত্তিক গণমুখী সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীর পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সাংবিধানিক নিশ্চয়তাসহ প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানিয়ে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন যেমন—গণহত্যা, হত্যা, ধর্ষণ, ধর্মীয় পরিহানী, চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, ধরপাকড়, নির্যাতন অগ্নিসংযোগ, প্রশাসনিক অবিচার প্রভৃতি ঘটনার অনেকে প্রত্যক্ষদর্শী ও শিকারও বটে। এ সমস্ত ঘটনায় তাদের আত্মীয় স্বজন ও জাতি ভাইয়ের ভোগান্তি একদিকে যেমন তাদের চরম হতাশা ও আত্মগ্লানি এনে দেয় অপরদিকে এসব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের অবচেতন মনে বিদ্রোহের সুরকে উজ্জীবিত করে। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরা আজ দিনে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। জুম্ম জাতির চরম দুর্যোগ ও অবলুপ্তি এ ক্রান্তিলগ্নে তারা কোন ভাবে নিশ্চুপ থাকতে পারে না। জুম্ম জাতির সবচেয়ে সচেতন ও সংগ্রামী অংশ হিসাবে তাদেরকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হয়েছে ও সবরকম অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুতি ও শপথ নিতে হচ্ছে।

জুম্ম ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ ও প্রচার

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতি উচ্ছেদ ও জাতি হত্যার বিভিন্ন সরকারী পদক্ষেপ ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জুম্ম ছাত্র সমাজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এ যাবত জুম্ম জাতির উপর সংঘটিত বিভিন্ন নির্যাতন, অবিচার, ধর্ষণ, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জুম্ম ছাত্র সমাজ সভা সমিতিও বিবৃতির মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করে আসছে।

১৯৮৬ সনে ১৫ই জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ঢাকা ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলনে সমতল ভূমি থেকে সরকার কর্তৃক অবৈধভাবে লক্ষলক্ষ বহিরাগতদের পুনর্বাসন, উপজাতীয়দের জমি বেদখল করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটিতে (Microscopic Minority) পরিণত করার অবসান ও ভষণছা হত্যাকাণ্ডের ফলে মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণকারী উপজাতিদের নিজস্ব জায়গায় নিরাপত্তার মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য জোর দাবী জানানো হয়। এ ছাড়া জুম্ম ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্যও দাবী জানানো হয়।

১৯৮৭ সনের ২৪শে জুন এইচ, এস, সি, পরীক্ষা চলাকালীন কালে গহিরা কলেজ হতে ৩ জন ছাত্রী সহ মোট ১০ জন জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীকে সরকারী পুলিশের অপহরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র ঐক্য ২৫শে জুন তারিখে একটি লিফলেট প্রচার করে। এতে জুম্ম পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলকে অনিশ্চিত করা ও তাদের শিক্ষা জীবনে হুমকি প্রদর্শনের অভিযোগ করে সরকারকে দায়ী করা হয় এবং অপহৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তির দাবী জানানো হয়।

২০শে জানুয়ারী "৮৭ ইং সনের জাতীয় সংসদে প্রদ...

পাঁচ পাতায়

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

৪এর পাতার পর

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রেক্ষিতে ঢাকা ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এতে ঢাকা ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন ভারতে আশ্রিত ৫০ হাজার জুম্ম শরনার্থীদের নিরাপত্তা ও পূনর্বাসনের ভিত্তিতে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার অনীহা, উন্নয়নের নামে জুম্মদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা, সেনাবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতি দমনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিক বাহিনী সমাবেশ ঘটিয়ে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে একটি রণক্ষেত্রে পরিণত করা ও জুম্মদের শিক্ষা সমস্যার অভিযোগ যুক্তিসহকারে তুলে ধরা হয়।

১৯৮৮ সনের ৮-১০ আগষ্ট বাঘাইছড়ি উপজেলায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র ঐক্য ২৩-৮-৮৮ ইং তারিখে এক লিফলেট প্রকাশ করে। এতে বাঘাইছড়ি উপজেলায় হীরাচর, সার্বোয়াতলী, খাগড়াছড়ি, পাবলাখালী, খেদারমারা, মহিষ পড়িয়া, শিজক মুখ প্রভৃতি গ্রামে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ড, ধর্ষন, লুটপাট, কাচালং কলেজে হামলা প্রভৃতি জঘন্য ঘটনাবলী স্পষ্টভাবে তুলে ধরে জুম্ম উচ্ছেদমূলক সরকারী কুমনোবৃত্তিকে স্পষ্টভাবে উন্মোচন করা হয়েছে।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ৪ই মে ৮৯ ইং তারিখে সংঘটিত লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদে ২৯ শে মে ৮৯ ইং তারিখে প্রকাশ করে এক অনন্য লিফলেট। এ লিফলেটে বর্বরোচিত লংগদু হত্যাকাণ্ডের নারকীয়তাও লংগদু উপজেলাস্থ বড়াদম, মহাজনপাড়া, হলধর কার্ব্বারী পাড়া, আঠারকছড়া, ইয়ারেংছড়ি প্রভৃতি জুম্ম গ্রামের উপর অনুপ্রবেশ কারীদের ধ্বংসলীলা তুলে ধরে হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত, শ্বেতপত্র প্রকাশ, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের ক্ষতিপূরন দানের দাবী করা হয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনীভাবে পুনর্বাসিত অপাহাড়ীদের প্রত্যাহার, ভবিষ্যতে এরূপ হত্যাকাণ্ড না ঘটার নিশ্চয়তা বিধান সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানানো হয়।

২৯শে অক্টোবর ১৯৯০ বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান দানোত্তম কঠিন চীবর দান সম্পন্ন করার পর বাড়ি প্রত্যাবর্তনের পথে ১০৭ নং ও ১০৮ নং বড়াদম মোজার ১৪ জন কিশোরী যুবতী, ২ জন বৃদ্ধা ও ২ জন যুবকের উপর সেনাবাহিনীর ৬৫ পদাতিক ব্রিগেডের ২১ বেঙ্গল রেজিমেন্টের পেট্রোল ডিউটিরত জোয়ানদের আক্রমণ ও কিশোরীদের ধর্ষনের প্রতিবাদে এক মর্মস্পর্শী লিফলেট প্রচার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনীর নৃশংস গণহত্যা ও নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে সরকারের মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক গণধিকৃত জেলা পরিষদ গঠনের ষড়যন্ত্রকে উন্মোচন করা হয়।

১৯শে ডিসেম্বর, '৯০ ইং তারিখে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিকদল ও ছাত্র সংগঠনের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে ৫ দফা দাবী উত্থাপন করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয় এবং পরিষদের নেতৃবৃন্দ সমবেত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এর আগে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে পরিষদের নেতৃবৃন্দ ছাড়া শফি আহম্মদ, মোস্তাফা ফারুক, নাসির উদ-দ্যোজা, নুর আহম্মদ বকুল, মমতাজ উদ্দীন প্রমুখ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তৃতা করেন। সারা দেশ থেকে আগত পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীরা এই সমাবেশের শেষে তাদের ৫ দফা দাবীর সমর্থনে একটি মিছিল করে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আসে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে দীর্ঘদিন ধরে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে টিকিয়ে রাখার অভিযোগ করা হয় এবং এ সমস্যার প্রতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ও তাঁর

ছয় এর পাতায়

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

৫ এর পাতার পর

উপদেষ্টা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশা প্রকাশ করা হয় যে, আগামীতে প্রতিষ্ঠিতব্য গণতান্ত্রিক সরকার পার্বত্য জাতি সত্তা-সমূহের দাবী দাওয়া সমূহ সর্বাগ্রে বিবেচনা করে সমস্যার সঠিক রাজনৈতিব সমাধানে উদ্যোগী হবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয় যে, পাহাড়ী ছাত্র নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে আট দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা, সাত দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং পাঁচ দলীয় জোট নেতা রাশেদ খান মেনন সহ তিন জোটের নেতৃবৃন্দের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে সাক্ষাৎ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ৫ দফা দাবী পেশ করেছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা নিম্নরূপ :

(১) গণ বিরোধী স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার কর্তৃক জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া পার্বত্য জেলা পরিষদ অবিলম্বে বাতিল।

(২) আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং জাতীয় সংসদে উপজাতীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি আসন উপজাতিয়দের জন্য সংরক্ষণ। প্রয়োজনে আসন সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। নির্বাচন প্রাক্কালে পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশ বিদেশী পর্যবেক্ষকের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর।

(৩) বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান ও শ্বেত পত্র প্রকাশ।

(৪) নির্বাচনের পূর্বে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে নিজ নিজ জমিতে সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও ভোটের তালিকা পুনঃপ্রণয়ণ। অন্যথায় তিনটি আসনের নির্বাচন আপাততঃ স্থগিত ঘোষণা।

(৫) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে অবিলম্বে দেশের রাজনৈতিকদল, জোট, কৃষক শ্রমিক, আইনজীবি, সাংবাদিক, পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবি, ছাত্র ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর, এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবীর প্রেক্ষিতে সমগ্র দেশে দারুন মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ৫ দফার বিপক্ষে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, সদস্যবৃন্দ, সরকারী দালাল সংস্থাসমূহের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু সংখ্যক ছাত্র। অপরদিকে ৫ দফা সমর্থন করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবি সমাজ, পাহাড়ী গণ পরিষদ, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি, কতিপয় রাজনৈতিক দল, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং ব্যাপক জুম্ম ছাত্র সমাজ।

৩০ শে ডিসেম্বর'৯০ ইং তারিখে বান্দরবন স্থানীর সরকার জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বান্দরবন জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পার্বত্য জেলা পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার দাবীকে অবান্তর বলে প্রত্যাখান করেন। (পার্বতী ৪ঠা জানুয়ারী'৯০ ও আজাদী ৩১-১২-৯০)।

জেলা পরিষদ বাতিলের ছাত্র পরিষদের দাবীর বিরোধীতা করে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান এক বিবৃতিতে বলেন, "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের সুচনা করিয়াছে। সুতরাং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দাবী মানিয়া নেওয়ার অর্থ পার্বত্য অঞ্চলের সুচিত রাজনৈতিক ইতিবাচক পরিবর্তনকে পাল্টাইয়া দেওয়া এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্তৃত্ব পুনরায় সরকারের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া।" (ইত্তেফাক ১৫-১২-৯১ ইং)

২৫ শে ডিসেম্বর'৯০ ই. তারিখে ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুলওয়াদুদ ভুঁইয়া, নক্ষত্র লাল দেবর্মন, মাহবুব আলম এবং রাঙ্গামাটি কলেজ সংসদের সভাপতি মুনিরুদ্দিন আহম্মদ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবীকে প্রত্যাখান করেন। ওয়াদুদ ভুঁইয়া বলেন, নির্বাচিত সংসদই জেলা পরিষদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তিনি আরো বলেন, শান্তিবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে নতুন বসতি স্থাপনকারীরা নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাহিরে কাজে যেতে পারে না। তবে শান্তিবাহিনীর আক্রমন হতে অউপজাতীয়দের রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছে। (২৬-১১-৯১ ইং বাংলাদেশ অবজারভার)

সাত এর পাতায়

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

৬ এর পাতার পর

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ৫ দফার দাবীর প্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটি জেলার বি এন পি'র সহ সভাপতি আতিকুল রহমান, স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য এ এস এম শহীদুল্লাহ, এম এ কাদের, সিরাজুল মোস্তফা, জামাতের জেলা সেক্রেটারী আব্দুল কালাম, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রাঙ্গামাটি ইউনিট কম্যাণ্ডের সহকারী কম্যাণ্ডার মীর ইয়াকুব আলী, মোখতা আহম্মদ, মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী, একযুক্ত বিবৃতিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দাবীকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তারা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সদস্যদের বিভ্রান্ত, ছদ্মবেশী শান্তিবাহিনী বলে উল্লেখ করে বলেন, এরা এই এলাকার স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। (পূর্বকোন, ৪ঠা জানুয়ারী' ৯১)

উল্লেখ্য যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফার দাবীর প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র সাংবাদিক সম্মেলন ও বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ ৫ দফা দাবীর প্রতিবাদে সামরিক কর্তৃপক্ষের ছত্রছায়ায় খাগড়াছড়ি ও মানিকছড়িতে হরতাল ও মিছিল করা হয়েছে। ২২শে ডিসেম্বর ১৯৯০ খাগড়াছড়ি জেলায় সকাল সন্ধ্যায় হরতাল পালিত হয়। যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা জেলা আপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় বলেন, রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্থানীয় সরকার পরিষদের কোন অশুভ শক্তির পায়তারা বরদাশ্‌ত করা হবে না। প্রয়োজনে রক্তের বিনিময়ে হলেও পরিষদ বিরোধী তৎপরতাকে প্রতিহত করা হবে। সভায় জেলা পরিষদ সদস্য অরুনোদয় চাকমা, পাইলাপ্রু চৌধুরী, রণ বিক্রম ত্রিপুরা, দোস্ত আহাম্মদ চৌধুরী ও নুরুন্নবী চৌধুরী বক্তব্য রাখে। (ইত্তেফাক,২৩—১২—৯০ ইং)

মানিকছড়িতেও জেলাপরিষদের সদস্য হাজী আবু তাহের এর সভাপতিত্বে নিহার দেবী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ম্রাগ্যা মারমা। সভায় বক্তব্য রাখেন আব্দুল মজিদ ভুঁইয়া, গিয়াস উদ্দীন, আশরাফুল আলম, এম রবিউল ফারুক, মোহম্মদ আলী, সুলতান উদ্দীন ও সফিউল আলম প্রমুখ। (পূর্বকোন, ৩১—১২—৯০ ই.)

এছাড়া গত ২২শে ডিসেম্বর' ৯০ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবীর বিরুদ্ধে রামগড় শহরে সকাল ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয় এবং মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে রামগড় বাস ষ্ট্যাণ্ডে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা আগামী দিনে স্থানীয় সরকার পরিষদই পার্বত্য অঞ্চল সমূহের সমস্যা সমাধানের বাস্তবও সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে পারবে এবং এলাকার পাহাড়ী বাঙ্গালীর জীবন যাপনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। বক্তারা ঢাকায় ছাত্রদের যে মিছিল হয়েছে তাদেরকে শান্তিবাহিনীর দালাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (গিরিদর্পণ, ২৮—১২—৯০ ইং)

পার্বতীর (১১—২৪ জুলাই'৯১) ২য় বর্ষ ৪৮ ও ৪৯ তম সংখ্যায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদকে শান্তি বাহিনী সমর্থকারী হিসেবে চিহ্নিত করে "শান্তিবাহিনীর সমর্থণকারী পাহাড়ী ছাত্র ও গণ পরিষদের বিভিন্ন মহলের তীব্র ক্ষোভ" এক সংবাদ পরিবেশন করা হয়। চাকমা উন্নয়ন সংসদ মারমা উন্নয়ন সংসদ, ত্রিপুরা উপজাতি কল্যান সংসদ, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, জেলা কল্যান পরিষদ, বাঙ্গালী কৃষক শ্রমিক কল্যান পরিষদ, উপজাতি কর্মকর্তা কল্যান সমিতি, প্রত্যাগত শান্তিবাহিনী কল্যান ট্রাষ্ট, মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট, জেলা সাংবাদিক ইউনিট ইত্যাদি সরকারী দালাল সংস্থা সমূহ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবীর প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বিবৃতিদাতারা আরো বলেন, পাহাড়ী ছাত্র ও গণ পরিষদের কথিত নেতারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে অমূলক, একপেশে, ভিত্তিহীন ও মনগড়া বক্তব্য রেখে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংহতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

পার্বতীয় ২য় বর্ষ ২১ তম সংখ্যায় (৪ঠা জানুয়ারী ৯১) "পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবী ও প্রাসংগিক ভাবনা" নামে সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, ১৯শে ডিসেম্বর উপজাতীয় ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় সমাবেশ, মিছিল, ও সাংবাদিক সম্মেলনে ৫ দফা দাবী ও ৩১ শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে উক্ত ৫ দফা দাবীর সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ফলে পার্বত্য

অষ্টম পাতায়

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

৭ এর পাতার পর

চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয় ও অউপজাতীয়দের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তরা—৯ই মে, পার্বতীতে (২য় বর্ষ ৩৮ তম সংখ্যা) অরণ্যকের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের "দাবী না বিভ্রান্তি" শিরোনামে এক উপসম্পাদকীয়তে সমতল জেলা হতে বাঙ্গালীদের অভিবাসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। এছাড়া আরও বলা হয় যে, জনসংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত বাংলাদেশে পার্বত্য অঞ্চলের জনসংখ্যার স্বল্পতার মধ্যেও অভিবাসনের যৌক্তিকতা রয়েছে।

এছাড়া ৯ই জুলাই বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র ঐক্য পরিষদের ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, পাহাড়ী জনগণ ও বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনা সভার প্রেক্ষিতে পার্বতীর ২য় বর্ষ ৫০ তম সংখ্যায় (২৫শে জুলাই-১লা আগষ্ট) আরো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। সম্পাদকীয়তে এসব সংগঠনের বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের নিহিত স্বার্থ চরিতার্থের অপপ্রয়াস চালানোর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বশেষে এসব সংগঠনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে চক্রান্তকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে বৃহত্তর পার্বত্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফাকে সমর্থন করে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে নব গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ পরিষদ। ৩১শে ডিসেম্বর/৯০ ইং তারিখে বিলিকৃত এক লিফলেটে পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফাকে স্বার্থহীনভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এর ৫ দফার প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করে এ লিফলেটে বলা হয় যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবীর বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সুবিধাবাদী গোষ্ঠী, গণবিরোধী জেলা পরিষদ সদস্য, জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা খাগড়াছড়িতে ২২শে ডিসেম্বর এক প্রহসনমূলক হরতাল পালন করেছে। পাশাপাশি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, এরশাদের দোসর গণ দুশমন গৌতম দেওয়ান সহ কতিপয় সুবিধাবাদী ব্যক্তি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের কতিপয় সদস্য জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ঢাকায় এক প্রহসনমূলক সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, এরশাদ সরকারের মনোনীত জাতীয় পার্টির ও গণধিকৃত জেলা পরিষদের ভোটার বিহীন নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যরা ক্ষমতাকে আঁকড়ে থেকে স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। জেলা পরিষদ সম্পর্কে লিফলেটে বলা হয় যে, বিগত ১৯৮৯ এর ২৫শে জুন পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণের তীব্র বিরোধীতার মুখে জোর করে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের পাতানো খেলার আয়োজন করা হয়। নির্বাচনের পূর্বে প্রতিটি প্রার্থীকে ৭৫ মণ চাউল, ৫০ হাজার টাকা করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বরাদ্ধ দেওয়া হয়। আপনাদের অজানা নয় যে, তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভোটারবিহীন প্রহসনমূলক নির্বাচনের ফসল হিসেবে স্বরাচারী এরশাদ কর্তৃক মনোনীত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী জনগণের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ধ্বংস করার অভিযোগ করে আরও বলা হয় যে, পাহাড়ী জনগণের মধ্যে বিদ্যমান ঐতিহ্যবাহী সৌহার্দ্যপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে চাকমা সংসদ, মারমা সংসদ ত্রিপুরা কল্যান সংসদ, তঞ্চঙ্গা পরিষদ, মরুং কমপ্লেক্স, টাইগার বাহিনী, প্রতিরোধ কমিটি, আমরা বাঙ্গালী, জন কল্যান সমিতি নামে নাম সর্বস্ব ক্যান্টনমেন্ট পকেট থেকে গড়ে উঠা সংগঠন জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, গত ৩১ শে ডিসেম্বর' ৯০ ইং তারিখে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সহযোগীতায় পাহাড়ী গণ পরিষদ চট্টগ্রামে এক বিক্ষোভ মিছিল ও গণ সমাবেশের আয়োজন করে। মিছিলটি লাল দিঘী হয়ে দোস্ত বিল্ডিং সংলগ্ন শহীদ ডাঃ মিলন চত্বরে শেষ হয় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক বিজয় কেতন চাকমা। সংগঠনের সদস্য সচিব প্রবীর তালুকদারেরর শুভেচ্ছ বক্তব্যের পর বক্তব্য রাখেন মংথোয়াই মারমা, শক্তিপদ ত্রিপুর মানস মুকুর চাকমা, প্রতিম রায় এবং ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ মফিজুর রহমান, জালাল উদ্দীন ইকবাল, জসীম উদ্দীন, খি অজিত দাশ, মিহির বিশ্বাস ও চারুস্বর এজিএস মাহবুবুর রহমা শামীম। এই সম্মেলনে পাহাড়ী গণ পরিষদ ৭ দফা দাবীনাম পেশ করে। এই ৭ দফার মধ্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নবম পাতায়

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

৮ এর পাতার পর

৬৭ জন বুদ্ধিজীবি ও ধর্মীয় নেতার বিবৃতি

তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণ, ৫০ হাজার জুম্ম শরণার্থীদেরকে ফিরিয়ে আনার আহ্বান ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফাকে সমর্থন জানিয়ে ৬৭ জন জুম্ম বুদ্ধিজীবি এক বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিতে আরো লেখা হয় যে, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার গণবিরোধী আন্দোলনে ডাঃ মিলন সহ শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে জনগণের বিজয় অর্জিত হয়েছে। তিন জোট মনোনীত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি অর্থবহ, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র উত্তরণের প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। এই লক্ষ্যে গণবিরোধী এরশাদ সরকারের দোসর জাতীয় পার্টির ৬১ টি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে ইতিমধ্যে অপসারণ করা হয়েছে। কিন্তু কি কারণে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় পার্টি কর্তৃক নিযুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি স্থানীয় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণ করা হচ্ছে না তা আমাদের বোধগম্য নয়। গণবিরোধী স্বৈরাচারী এরশাদের দোসর তিনজন স্থানীয় পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণ ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে তাদের অপসারণ করা এবং আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতে অস্থানরত ৫০ হাজার উপজাতীয় শরণার্থীকে নির্বাচনের পূর্বে ফিরিয়ে আনা হোক। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ উত্থাপিত ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সমর্থিত ৫ দফা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের পথকে উন্মোচিত করবে। তাই আমরা অবিলম্বে দেশের সকল রাজনৈতিক দল, জোট, আইনজীবি, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, ছাত্র ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহর এবং উপজাতীয় জনগণের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উপজাতীয় সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধান করার দাবী জানাচ্ছি। আমরা এ ব্যাপারে সকল প্রগতিশীল, মনবতাবাদী, গণতান্ত্রিক শক্তিকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ জুম্ম বুদ্ধিজীবিগণ এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। এদের মধ্যে ৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ১০ জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র, ৯ জন ডাক্তার, ১৪ জন ইঞ্জিনিয়ার ২ জন স্থপতি, ২ জন কৃষিবিদ, ৪ জন ব্যবসায়ী, ৫ জন রাজনীতিবিদ, ২ জন ভিক্ষু, ১৩ জন সরকারী চাকুরীজীবি ও ১ জন জাতীয় শিক্ষক রয়েছেন।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সমর্থন

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফাকে সবচেয়ে জোরালো স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়েছে বাংলাদেশের সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সব ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ। ১৯শে ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ যোগদান করেন ও কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ ৫ দফাকে সমর্থন করে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। এ সমাবেশে ৫ দফা দাবীর অকুণ্ঠ সমর্থনে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন শফি আহম্মেদ, মোস্তফা ফারুক, নাসির উদ-দোজা, নুর আহম্মদ বকুল, মমতাজ উদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়া ৩১ শে ডিসেম্বরে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ৫ দফা দাবীর সমর্থনে চট্টগ্রামে আয়োজিত মিছিল ও সমাবেশে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ এবং বক্তব্য পেশ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন মুজিফুর রহমান, সুভাষ আইচ, মাসুদ রহমান, মাহবুবুর রহমান, জালাল উদ্দীন, যিশু অজিত দাশ, মিহির বিশ্বাস ও চাকসুর এজিএস মাহবুবুর রহমান শামীম। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্র উত্তরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারা দেশে সুষ্ঠুভাবে ২৭ শে ফেব্রুয়ারীর জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে আগামী সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের উত্থাপিত দাবী দাওয়া রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি সমাজও এরশাদ সরকার প্রদর্শিত

দশম পাতায়

জুম্ম গ্রেপ্তার, নির্যাতন, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ

গত ১৪ই আগষ্ট, করেঙ্গাতুলী আর্মি ক্যাম্পের অধিনায়ক ক্যাঃ মারুফ (২৮ বেঙ্গল) একই গ্রামের ৪ জন নিরাপরাধ জুম্মকে তাদের বাড়ী থেকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করেছে। তাদেরকে ক্যাম্পে অমানবিকভাবে অত্যাচার করা হয়। বর্তমানে তাদেরকে মারিশ্যা আর্মি ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এরা হলো ১) লক্ষী কুমার চাকমা (৫৫) পীং বগড়া চাকমা, ২) ললিত কান্তি চাকমা (৪০) পীং রাজমনি চাকমা। ৩) চোগা চাকমা (৩২) পীং লক্ষী কুমার চাকমা, (৪) প্রভাত চন্দ্র চাকমা (৩৮) পীং মনমোহন চাকমা। এরা সবাই বাঘাইছড়ি উপজেলার বালুখালী গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা।

গত ১৫ই আগষ্ট, একই উপজেলার কজৈছড়ি ও চিন্তারাম ছড়া আর্মি ক্যাম্পের ৬০/৭০ জন আর্মি শিজক এলাকার গবছড়ি গ্রামবাসীদের উপর এক হামলা চালায়। হামলার সময় ৯ জন নিরাপরাধ জুম্মকে বেদম প্রহার, মূল্যবান সম্পত্তি লুট ও তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই হামলায় নেতৃত্ব দেয় মেজর রেজাউল' ক্যাপ্টেন মেজবাহুল ইসলাম ও ক্যাঃ তৌহিদ। প্রহারে আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ জুম্মরা হচ্ছে :—

১।	বীরেন্দ্র চাকমা (৬০)	পীং মনচন্দ্র চাকমা	ক্ষতি— ১৭০০০/- টাকা
২।	সুরেশ কুমার চাকমা (৩৬)	পীং যামিনী চাকমা	,, — ৫০০০/- ,,
৩।	অমিয় কান্তি চাকমা (৩১)	পীং যামিনী চাকমা	,, — ৬০০০/- ,,
৪।	কামদেব চাকমা (৩২)	পীং কিষ্ট মোহন চাকমা	,, — ৩০০০/- ,,
৫।	কালাবোয়া চাকমা (২৮)	পীং লাম্বা চাকমা	,, — ৫০০০/- ,,
৬।	বিশিক্য চাকমা (৩০)	পীং লুইতাং চাকমা	,, — ৫০০/- ,,
৭।	লুইতাং চাকমা (৬০)	পীং লেপ্যা চাকমা	,, — ১৫০০০/- ,,
৮।	শান্তি বিকাশ চাকমা ( )	পীং বীরেন্দ্র চাকমা	,, প্রহারে অর্ধমৃত ও ঘোরতর আহত হয়

৯। রবি প্রভা চাকমা (১৯) পীং বীরেন্দ্র চাকমা, প্রহার ও শিজক নদীতে সাঁতার কাটতে বাধ্য করা হয়।

সাতাশ পাতায়

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

৯ এর পাতার পর

পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কে তাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে- ছেন। পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কে বুদ্ধিজীবিদের মতামত জানা- জন্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগরী শাখা ৫ জন বুদ্ধি- জীবির নিকট হতে ৯টি প্রশ্ন সম্মলিত একটি প্রশ্নমালার উত্তরমাল সংগ্রহ করে। এ সকল প্রশ্নাবলীর মধ্যে ৬ নং প্রশ্নটি ছিল-পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও বাংলাদেশের অপরাপর জেলা পরিষদে মধ্যে গঠনতন্ত্র ছাড়া তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। অথচ এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের আসল প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে জেলা পরিষদ চাপিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের অপপ্রয়াস চালান। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এ প্রশ্নের জবাবে বিচারপতি কে, এম, সোবহান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, ডঃ আহম্মদ শরীফ, ভুত পুর্ব অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম, ভুতপুর্ব অধ্যাপক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পার্বত্য জেলা পরিষদ চালিয়ে দেওয়ার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আর ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বলেছেন "জেলা পরিষদ চাপিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি" এবং জনাব আনুমোহাম্মদ সহযোগী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, বলেন "যেভাবে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে তাতে পার্বত্য জনগণকে প্রতারণ করা হয়েছে। জেলা পরিষদকে অবশ্যই বাতিল করতে হবে"। (প্রেমি সবৈ-সা-বি সংকলন ১৩৯৭ বাংলা, পাহাড়ী ছাত্র, পরিষদ ঢাকা শাখা)

আঠাশ পাতায়

জুম্ম নারী অপহরণের চেষ্টা ব্যর্থ

কাউখালী বাজার, রাঙ্গামাটি। বিগত ০৬-০৬-৯১ ইং ঘাগড়া জোনের নিয়ন্ত্রণাধীন ঘিলাছড়ি পুলিশ ক্যাম্পের ৩ জন পুলিশ ও জন জুম্ম যুবতী মেয়েকে অপহরণের অপচেষ্টা করে। যুবতী মেয়ে তিনটি ঐদিন কাউখালী বাজারে পৌঁছলে তাদেরকে কাউখালী বাজারস্থ সোনালী ব্যাংক বিল্ডিং-এর গোপন কক্ষে আটকে রাখা হয়। এই অপহরণ ও আটকে রাখার খবর পেয়ে জনৈক মঙ্গল কুমার চাকমা তার ২ জন সহযোগীকে নিয়ে মেয়ে ৩জনকে উদ্ধার করতে গেলে সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার মেয়েদেরকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু উদ্ধারকারীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত মেয়েদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং জুম্ম নারী অপহরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য যে, এই অপহরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এই ৩ জন জুম্ম নারী হলো :—

১) শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী চাকমা (১৮) পীং স্নেহ কুমার চাকমা, গ্রাম—তালুকদার পাড়া, ৯৮ নং কাউখালী মৌজা,

২৭ পাতায়

সরকারী প্রহসন

গত সনের ডিসেম্বর মাসে শিশুসহ ৩ জন কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ আজ শোকাভিভূত, হতবাক ও বিমূঢ়। আর এই হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে জুম্ম জনগণ আরো প্রত্যক্ষ করেছে এক অদ্ভুত নির্লজ্জ প্রহসনের নাটক। মরা হাতিকে কুলো দিয়ে ঢাকার হীন অপপ্রয়াসই নাটকের প্রধান বিষয়। যুক্তির মাধ্যমে হত্যাকারীদের অন্তর্ধান হারিয়ে দিয়েছে যাদু সম্রাট পি সি সরকারের লৌহার সিন্দুক হতে অন্তর্ধানের যাদুকে। শুধু তাই নয়, মানিকছড়ি উপজেলা থেকে প্রকাশিত 'পার্বত্য ভূমি' (১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং) সংযোজন করেছে হত্যাকাণ্ডের এক দায়িত্বহীন কাল্পনিক প্রতিবেদন।

হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ঘটনাটি নিম্নরূপ। গত ২৮শে ডিসেম্বর, ৯০ ইং খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মী ছড়ি উপজেলার ১ নং লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের বাসিন্দা শ্রীবাঙ্গাল্যা চাকমার দুই কিশোরী কন্যা যথাক্রমে শুক্র মালা চাকমা (১৮) ও আনন্দ মালা চাকমা (১৪) একমাত্র পুত্র সতীশ কুমার চাকমা (১০) এবং শ্রীশুক্রচার্য চাকমার কন্যা নিরন দেবী চাকমা (১২) দুপুরে ভাত খাওয়ার পর গরমারা ছড়াতে মাছ কাকঁর ধরতে যায়। সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরে না এলে গ্রামবাসীরা দিবাগতরাতে তাদের খোঁজ করতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে আসে। গ্রামবাসীরা বিষয়টি স্থানীয় আর্মি ক্যাম্পে জানায়। পরদিন সকালে গ্রামবাসীরা নিরাপত্তা বাহিনী সহ অনেক খোঁজাখুঁজির পর গরমারা ছড়ার পাশে তাদের ক্ষতবিক্ষত লাশ খুঁজে পায়। লাশগুলোর হাত পা বাঁধা ছিল। তাদেরকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। কিশোরীদের স্তন, চোয়াল, গাল, ত্বকের দাঁতের ক্ষত ছিল। হত্যার নৃশংসতায় সবাই অভিভূত হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলের কাছে তাদের মাছ ধরার সরঞ্জাম লুই, ডলা, বাসন, দা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ঘটনাস্থলটি ১০ নং নিরাপত্তা পোষ্ট হতে ৩০০—৫০০ গজ দূরত্বে যেখানে দিনের বেলায় ৮ জন ভিডিপি পাহাড়ায় রত ছিল এবং সেখানে ভিডিপিদের পরিত্যক্ত জুতার ছাপ ও ধূমপান করা বিড়ির শেষাংশ পাওয়া যায়। লাশগুলো সেইদিন ময়না তদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি সদরে চালান দেয়া হয়। ময়না তদন্তের পর ৩০শে ডিসেম্বর লাশগুলো তাদের মা-বাবার কাছে দাহ করার জন্য হস্তান্তর করা হয়। এটা হলো হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

লাশগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার পর শুরু হয় প্রহসনের নাটক। স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা প্রহসনে অংশ গ্রহণ করেন। জুম্ম জনগণ হতবাক হয়ে প্রহসনের অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে থাকে। পার্বত্য ভূমির সেই প্রতিবেদকও প্রহসন নাটকের ধারাবিবরণী লিপিবদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। তিনি অভিনেতাদের অভিনয়ের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেন এভাবে—নাটকটির প্রথম ও শেষ দৃশ্য অভিনীত হয় শনিবার (২৯ শে ডিসেম্বর) সকাল বেলা স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পে। নাটকের এই দৃশ্যে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় নিরাপত্তা ক্যাম্পের জোন কমান্ডার, উপজেলা চেয়ারম্যান রাম্মাচাই মারমা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলার ডাক্তার প্রমুখ আরো

বার পাতায়

সরকারী প্রহসন

১১ এর পাতার পর

অনেকে। কিন্তু দর্শক ছাড়া নাটক মূল্যহীন। তাই দর্শকের গ্যালারীতে উপস্থিত থাকে নিহতদের পিতাদ্বয়সহ কয়েকজন জুম্ম ও মুসলমান বাঙ্গালী। প্রহসন দৃশ্যের শুরুতে নিহতদের পিতাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা এ ঘটনার জন্য কাকে সন্দেহ করছে? অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! এই ভাগ্য বিড়ম্বিত পিতাদ্বয়কে বলতে হয়েছে—না, কাউকে না। তারা বলতে পারেনি ঘটনাস্থলের জুতার ছাপ ও বিড়ির শেষাংশ কি নির্দেশ করে। বস্তুত হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে তারাই এবং তখনই তাদের হত্যার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হচ্ছিল। কাউকে সন্দেহ করলে বিপদ। তখন অবশ্যই বলতে হবে ১০ নং সেক্টর পোষ্টের পাহাড়ারত ভিডিপিদের কথা! তাদেরকে সন্দেহ করা মানে স্বয়ং উপস্থিত মহানায়ক জোন কম্যাণ্ডারকে সন্দেহ করা। যার অনিবার্য পরিনতি হচ্ছে রাত্রে গুম হওয়া। তাদের ছেলেমেয়েদের সহগামী হওয়া। তাই তারা জবাব দেয় না। এরপর শুরু হলো অভিনেতাদের স্বগতোক্তি। বেটারা বেঁচে গেলো। এরপর অনেক সহানুভূতি দেখালো। কুমীরাশ্রু বর্ষন করলো নিহতদের উদ্দেশ্যে। পরিশেষে দাঁত কামড়িয়ে জোন কম্যাণ্ডার বললেন তাহলে কে বা কারা করলো এ কাজ?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অন্যান্য সবাই উদগ্রীব। শুরু হলো তাদের বিদ্যাম্বরী যুক্তির ছোড়াছড়ি। যুক্তির পর যুক্তি উপস্থাপনায় আসর সরগরম হয়ে উঠে। প্রথম যুক্তি হলো বাঙ্গালীরা কখনো এই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে না। কারণ সকলের জোরালো যুক্তি এখন বাঙ্গালী ও জুম্মদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আর সেই রকম দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে যেতে বাঙ্গালীরা সাহস করবে না। কি অকাট্য যুক্তি! সুতরাং বাঙ্গালীদেরকে হত্যাকাণ্ডের সাথে আর জড়ায় কে? তাহলে কারা হতে পারে? এবারে স্বভাবতঃই দৃষ্টি পড়লো শান্তি বাহিনীর উপর। তাদের ভাষায় সন্ত্রাসীদের উপর। সকলের ধারণা সন্ত্রাসীরা হতে পারে হত্যাকাণ্ডের নায়ক। তাদের যুক্তি, হয়তো সন্ত্রাসীদেরকে শিশুরা দেখতে পেয়েছিল। এতে সন্ত্রাসীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। যেহেতু কাছে নিরাপত্তা পোষ্ট। সুতরাং শিশুদের হত্যা করে নিরাপত্তা বিধান করা ছাড়া সন্ত্রাসীদের কোন গত্যান্তর ছিল না।

অদ্ভুত যুক্তি। নিরাপত্তা পোষ্টের দূরে না নিয়ে কাছে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করলো। মহানায়ক জোন কম্যাণ্ডার কিন্তু অভিনেতাদের এই যুক্তি উপস্থাপনায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি চান জোরালো উপস্থাপনা। তাই তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সন্ত্রাসীরা অউপজাতীয় হত্যা করতে পারে কিন্তু নিরাপরাধ উপজাতীয় শিশুদের হত্যা করবে কেন? এক পাকা অভিনেতা যুক্তির বাণ ছুড়ে মারলো তখন, হয়তো সন্ত্রাসীদের সঙ্গে এমন কেউ ছিল যাকে শিশুরা চিনতো। শিশুদের ছেড়ে দিলে তার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে বিপদে পড়তে পারে। তাই শিশুদের হত্যা করা ছাড়া সন্ত্রাসীদের কোন উপায় ছিল না। কি জলন্ত যুক্তি! উর্বর মস্তিক হার মানলো এই যুক্তির কাছে। সকলে গভীর ভাবনার অতলে তলিয়ে গেল। হ্যাঁ তাই হবে। শেষ পর্যন্ত অবোধ শিশুরা নৃশংসতার শিকার হলো।

প্রহসনের নাটকে অভিনয় এখানেই শেষ। মৃতদেহগুলি খাগড়াছড়ি সদরে পাঠানো হয়। এবং সকলের অনুরোধে মহানায়ক মৃতদেহ সৎকারের যাবতীয় খরচ বহন করে বাঙ্গালী শুক্রচার্য চাকমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। কি এক অদ্ভুত মহানুভবতা! পার্বত্য ভূমির প্রতিবেদক এ প্রহসন নাটকের চিত্র তুলে ধরেন নিখুঁতভাবে। এর সাথে সাথে প্রতিবেদক সকলের অজান্তে অত্যন্ত সুকৌশলে কতগুলো ভেলকি দেখিয়েছেন। প্রথমতঃ প্রতিবেদক মৃত কিশোরীদের বয়স কমিয়ে করেছেন শিশু, যাতে ধর্ষনের বিষয়টি তিনি এড়ানোর জন্য বার বার উল্লেখ করেছেন। প্রতিবেদক নিজে কিশোরীদের স্তন, চোয়াল, গাল ও চিবুকের দাঁতের ক্ষত দেখলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে পারেননি। এমনকি ময়না তদন্তে ঐ ক্ষত চিহ্নগুলি ডাক্তারদের চোখের আড়ালে পড়ে যায়। প্রতিবেদক অবশ্য স্বীকার করেছেন, লাশগুলি নিরাপত্তা বেষ্টনী হতে মাত্র আধ কিলোমিটার দূরে পাওয়া যায়। আসলে ঘটনা স্থলটি ১০নং ভি

পরের পাতায়

পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের হালচাল

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি জেলা পরিষদকে প্রস্তাবিত ২২টি বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। গত ৯ই জুন ঢাকায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মোঃ শাহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কাউন্সিল কমিটি-এর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদকে ২২টি বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানের (হস্তান্তরের) তথাকথিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কথায় বলে ঠেলার নাম বাবাজী। ঠেলায় কিনা হয়! এক ঠেলায় সোজা হয় বাঁকা আর বাঁকা হয় সোজা। বাংলাদেশ সরকারের অবস্থাও তথৈবচ। গণধিকৃত তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদকে পুনরায় এ ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় প্রসূত নয়। বরং ইহা নির্দিধায় বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা। গত দু'বছরে জেলা পরিষদের বাস্তবায়ন উচ্চ পর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তাদের গালভরা প্রতিশ্রুতি ও বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ যাবৎ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সভা সমিতি, গণ সমাবেশে যাদুকরের যাদুর কাঠির মতো কল্পনাদি দিয়ে জেলা পরিষদ বাস্তবায়ন খেলা দেখানো হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের এই যাদুর কাঠির ভূমিকা দেখে মোহমুক্তি ঘটিয়েছে। উচ্চ স্তরের সামরিক কর্মকর্তাদের উন্নয়ন উপাখ্যান শুনতে শুনতে শ্রবনেন্দ্রিয়ের সংযমের পরিচয় দিয়েছে, শান্তির অন্বেষায় শান্তি গ্রাম, বড়গ্রাম ও গুচ্ছগ্রামে সরকারী জল্লাদ বাহিনী ও সহযোগী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের উন্মুক্ত তরবারীর নিচে কোরবানীর পশু হয়ে চির শান্তির দিন গুনছে। কিন্তু কতদিন চলবে এ তালবেতাল খেলা? বিশ্ববিবেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তালবেতাল খেলা আজ বেসামাল হয়ে পড়েছে। তাই তাল সামলাতে আরো এক তালের সৃষ্টি। এবার জেলা পরিষদকে ক্ষমতা প্রদানের তাল। প্রহসনের তাল। বস্তুত জেলা পরিষদকে নূতন করে ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠে না। কারণ পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ যেহেতু জনগনের ভোটে নির্বাচিত এবং এ পরিষদ একটা গণ প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ যেহেতু পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের সাথেই নির্ধারিত খাত (Subjects) সমূহে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে যাওয়ার কথা। কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদ হচ্ছে একটা ভাওতাবাজী রাজনৈতিক প্রহসন। অতএব এই নির্বীর্য পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রয়োজন তার প্রভুদের দয়া দাক্ষিণ্য। এখন তলিয়ে দেখা যাক এ প্রহসনমূলক তালের মূল রহস্য কি?

গত ২৩শে মে লণ্ডনে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এ রিপোর্টের উপর দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বে ৭টি দেশের মানবতাবাদী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গত বছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে যথাক্রমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের অনুসন্ধান চালিয়ে যায়। এ কমিশন হলো একমাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা যাকে স্বাধীনভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও অনুসন্ধানের অনুমতি দিতে বাংলাদেশ সরকার বাধ্য হয়েছে। বস্তুতঃ এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের কোন গত্যন্তর ছিল না। দুর্ভাগ্য যে, জেনে শুনে নিজ পেটের নাড়িভুড়ি ঘাটানো অনুমতি তাকে দিতে হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ৬ মাস পর্যালোচনার পর প্রকাশ করেছে অনুসন্ধানের চূড়ান্ত রিপোর্ট। এ রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের জঘন্য ঘটনা- গণহত্যা, ধরপাকড়, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, নির্মম হত্যাকাণ্ড, জোরপূর্বক জুম্ম নারী বিবাহ, ভূমি বেদখল, পরধর্মে পরিহানী সহ ইসলাম ধর্মে

চৌদ্দ পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

১৩ পাতার পর

ধর্মান্তরিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদেরকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ও নির্মূল করার ঘৃন্য ষড়যন্ত্র। বিগত বিশ বছর যাবৎ বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব বিবেককে ধোঁকা দিয়ে সংঘটিত করেছে এসব মানবাধিকার লংঘন। বিশ্ব বিবেক আজ বিস্ময়াভিভূত, হতকত্যবনাও বিহ্বল। রিপোর্টে প্রকাশিত কলমপতি ও লংগদু হাকাণ্ড হার মানিয়েছে মধ্য যুগের বর্বর হত্যাকাণ্ডকে, জুম্ম নিধ পরিকল্পনা হার মানিয়েছে হিটলারের ইহুদি নিধন ও নির্মূল করার ষড়যন্ত্রকে। ১৪ জন কিশোরীকে ধর্ষণ যেন বিশ্ব মানব সমাজকে মধ্য যুগের দুর্বলের উপর সবলের বর্বর পশুত্বের আচরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশ সরকারের এসব নৃশংস ও জঘন্য মানবাধিকার লংঘন আজ বিশ্ব মানবতাবাদী সংস্থসমূহের নিকট আয়নার মতো পরিস্কার। জাতি সংঘের মানবাধিকার কমিশন, আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা (IWGIA), এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, সার্ভাইভেল ইন্টারন্যাশনাল, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, (ILO) ইত্যাদি প্রতিটি আন্তর্জাতিক সংগঠন এ যাবৎ এসব মানবাধিকার লংঘনের চিত্র তুলে ধরে আসছে। বিগত বছর গুলোতে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লংঘনের উপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের প্রত্যক্ষ ও নিরপেক্ষ তদন্তের রিপোর্টেও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর সংঘটিত গণহত্যা, অত্যাচার, নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, ভূমি বেদখল, হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, অনুপ্রবেশ, ধর্মীয় পরিহানীসহ জুম্ম জাতি উচ্ছেদ ও নির্মূল করার ইত্যাদি ষড়যন্ত্র নিখুঁত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের এ নিরপক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের তথ্যাবলী কে বিশ্বাস না করবে? কোন মানবতাবাদী হৃদয়ে সাড়া না জাগায়? তাই আজ বিশ্ব বিবেক বাংলাদেশ সরকারের নিষ্ঠুরতা কটাক্ষ করছে। বাংলাদেশ সরকার আজ বিশ্ব মানবতার কাছে ধিকৃত, নিন্দিত ও বিবেক পীড়িত। পরিনামে বাংলাদেশ সরকারকে আজ বিশ্বের মানবতাবাদী সংস্থা ও সরকারের নিকট এসব মানবাধিকার লংঘনের জন্য জবাবদিহি ও মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে ও বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে বৈদেশিক ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এসব সাহায্যের অর্থ ব্যয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্যকারী দেশসমূহের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষনের শর্ত আরোপ করা হয়। এসব আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের অধিকার সংরক্ষণের অছিলায় গণধিকৃত ও সরকারী দালাল সংসদ পার্বত্য জেলা পরিষদসমুহকে ২২টি বিষয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রহসনমূলক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

পার্বত্য জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের অধিকার প্রদানের নামে আইনগতভাবে ভূমি অধিকার হরণের এক ষড়যন্ত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের উচ্ছেদ ও নির্মূল করার এক নিখুঁত নীলনকশা। এ আইনে জুম্মদের বেদখলকৃত জমি ফেরত/ উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেই, বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে নেয়ার কোন ক্ষমতা নেই। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের সংখ্যালঘু -উচ্ছেদ ও নির্মূল করার পথকে প্রশস্ত করেছে। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙ্গালী মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করেছে। এ জেলা পরিষদ আইন তাই জুম্ম স্বার্থ বিরোধী, গণধিকৃত, অগণতান্ত্রিক ও জুম্ম উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের নীলনকশা। অপরদিকে জুম্মদের সীমিত অধিকার প্রদানের নামে বিশ্ব বিবেককে বিভ্রান্ত করার এক অপকৌশল। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক দল "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" ও জুম্ম জনগণ এই আইন শুরুতেই প্রত্যাখান করেছে।

অপরদিকে, বাংলাদেশ সরকার এ জেলা পরিষদ আইনকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে প্রচার করে চলেছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করে তথাকথিত সীমিত স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা করে জুম্মদের অধিকার সংরক্ষনের প্রয়াসী হয়েছে বাংলাদেশ সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য গৃহীত সর্বশেষ পদক্ষেপ হচ্ছে এ পার্বত্য জেলা পরিষদ। জনসংহতি সমিতি এবং জুম্ম জনগণের প্রবল বিরোধীতার মুখে ১৯৮৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তড়িঘড়ি করে জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়

পনের পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

১৪ পাতার পর

এবং জুন মাসে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। যথারীতি নির্বাচিত জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের লোক দেখানোভাবে "শপথ" গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। শুরু হয় জেলা পরিষদ নাটকের অঙ্গ সজ্জিত নটদের বৃথা বাগাড়ম্বর। সারা বিশ্বে প্রচার করা হয় জুম্মদের অধিকার প্রদানের কৌতুকাভিনয়। বিশ্ব বিবেক কিছুক্ষণের জন্য জিজ্ঞাস্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয় এ চতুরাভিনয়ে। পত্রখচিত সবুজ রঙের পোষাকে সজ্জিত শান্তির বিহঙ্গ জেনারেলদের পাশে বসে পোষমানা পাখির মত শেখানো বুলি আওড়াতে থাকে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানত্রয় - গৌতম, সমীরণ ও সাচিংপ্রু, পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন সভাসমিতিতে। উন্নয়নের ঘুম পাড়ানি গান শুনাতে থাকে জুম্ম জনগণকে। শান্তির নামে চার শতাধিক সামরিক ছাউনী থেকে প্রকম্পিত হয় এল এম জি'র বাট ক্যারাব। অসহায় ও নীরিহ জুম্ম জনগণের ভয়ার্ত ক্রন্দন রোল এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে। নেমে আসে শান্তি, নিস্তব্ধ হাহাকার। আর জেনারেলদের সুগন্ধি বিমোহিত অফিস কক্ষে চলতে থাকে গম, চাল- ডালের ভাগাভাগি। গম-চাল- ডালের সব বেশী অংশ নিয়ে জেলা পরিষদের নটদের মুখে বিজয় হাসি ফুটে উঠে। গোমড়া মুখে বাড়িতে ফিরে উচ্ছিষ্ট হজমের জন্য গিলতে থাকে স্বর্গীয় পানীয় সুরা। এতে নটদের কি সুখ, কি প্রশান্তি! অবশেষে জুম্ম জনগণ মোহমুক্তি লাভ করে সরকারী উন্নয়ন উপাখ্যান ও জেলা পরিষদ সদস্যদের সরকারী উচ্ছিষ্ট ভাগাভাগি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের যাদুর কাঠির ভূমিকা দেখে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, প্রায় দু'বছর আগে জেলা পরিষদ গঠিত হলেও বাংলাদেশ সরকার কিন্তু এখনও কোন ক্ষমতা প্রদান করেনি জেলা পরিষদকে। বস্তুত জেলা পরিষদের কোন ক্ষমতা আছে কিনা তা সবায়ের নীরব জিজ্ঞাস্য। জেলা পরিষদ আইনে ৩১ নম্বর ধারায় ২২টি বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। আসলে এ প্রস্তাবিত বিষয়গুলো কি কাজ করার ক্ষমতা বা অধিকার, না বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণের স্বার্থে প্রদত্ত পরামর্শ বা অঙ্গীকার? বাংলাদেশ সরকার দাবী করছে জেলা পরিষদসমূহকে এ সব ক্ষমতা বা অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে জেলা পরিষদকে উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে যা সম্পাদন করতে জেলা পরিষদ সমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ যাবৎ জেলা পরিষদ সমূহকে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও কৃষি এ তিন বিষয়ে তথাকথিত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। এবারে খতিয়ে দেখা যাক শিক্ষা বিষয়ে হস্তান্তরিত ক্ষমতার কার্যকারিতা কতটুকু।

খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে শিক্ষা বিষয়ক হস্তান্তরিত প্রবিধান

বিষয়: প্রাথমিক শিক্ষা

(১) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাহার অফিসে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অধীনে প্রেষণে নিয়োগ।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিয়োগ, বদলী ইত্যাদি।

শর্তসমূহ :

(ক) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা সদরে তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে প্রেষণে নিয়োগ করা হইবে। এই সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বেতন, ভাতা ইত্যাদি ব্যয় উপজেলা পরিষদের ব্যয় বরাদ্দ এর অনুরূপ স্থানীয় সরকার পরিষদে ন্যস্ত করা হইবে।

(খ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা এর প্রতিনিধি হিসাবে বর্তমানে যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/

ষোল পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

১৫ পাতার পর

শিক্ষিকা ও তাহার আওতাধীন উপজেলা শিক্ষা অফিস সমূহে কর্মরত অফিসার ও কর্মচারীদের আন্তঃ উপজেলা পর্যায়ে বদলী ইত্যাদি পালন করিতেছেন তাহা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নিকট ন্যস্ত করা হইল। তবে উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের বদলির ব্যাপারে প্রচলিত ক্ষমতা ও পদ্ধতি অব্যাহত থাকিবে।

(গ) তদ্রুপ তিনটি পার্বত্য জেলার মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা বদলী, এবং জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলী সংক্রান্ত কার্যাদি উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম যথারীতি সম্পাদন করিবে।

(ঘ) বর্তমানে প্রচলিত কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা নির্বাচন কমিটির পরিবর্তে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে নিম্নরূপ প্রাথমিক শিক্ষা নির্বাচনী কমিটি গঠিত হইবে।

(১) চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ— সভাপতি

(২) জেলা প্রশাসক— সদস্য

(৩) অধ্যক্ষ, সরকারী মহাবিদ্যালয়— সদস্য

(৪) সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান— সদস্য

(৫) স্থানীয় সরকার পরিষদের একজন সদস্য — সদস্য
(সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(৬) সিভিল সার্জন—সদস্য

(৭) প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী, সরকারী বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (জ্যেষ্ঠ) —সদস্য

(৮) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা—সদস্য সচিব

ঙ) উক্ত কমিটি সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৩ (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রঃ) এবং সরকার কর্তৃক সময়ে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত আদেশাবলী অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক/ শিক্ষিকা নির্বাচন সম্পাদন করিবে।

(চ) এই কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে জারীকৃত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং- ১ আর - ১৩ (নিয়োগ)/ ৮৮- প্রাই/ ২৯৮৬ তারিখ ২০/ ১১/ ৮৯ ইং (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রঃ) অনুযায়ী প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার (পরিশিষ্ট 'গ' দ্রঃ) আলোকে তিন সদস্য বিশিষ্ট জেলা নিরীক্ষা কমিটি (পরিশিষ্ট 'ঘ' দ্রঃ) দ্বারা নিরীক্ষার ব্যবস্থাকরণ, যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, নির্ধারিত নিয়মাবলী (পরিশিষ্ট 'ঙ' দ্রঃ) অনুসারে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ, কোড নম্বরের সাহায্যে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থাকরণ এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা (পরিশিষ্ট 'চ' দ্রঃ) অনুযায়ী ফলাফল নির্ধারিত এবং উপজেলা ভিত্তিক মেধা তালিকা প্রণয়ন ও নির্ধারিত নিয়োগ নির্দেশিকা (পরিশিষ্ট 'ছ' দ্রঃ) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নিয়োগাদেশ ইস্যুর নিমিত্তে উহা উপজেলায় প্রেরণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করিবেন।

(ছ) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্তৃক বিধি/ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ সরকারী বিধি/ প্রবিধি/ আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেন।

(জ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নৈমিত্তিক ছুটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান বা তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদান করিবেন। অন্যান্য ছুটির বেলায় বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম বহাল থাকিবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ও

সতের পাতার

পরিষদ সমূহের হালচাল

১৬ পাতার পর

অন্যান্য ছুটির ক্ষেত্রে ও বর্তমান নিয়ম অব্যাহত থাকিবে।

(ঝ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক স্কুল উন্নয়নে বর্তমান নিয়ম বজায় থাকিবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বড় ধরণের মেরামত, সম্প্রসারণ কিংবা নূতন বিদ্যালয় নির্মান ইত্যাদির ব্যয় শিক্ষা মন্ত্রনালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার পরিষদ উহার নিজস্ব তহবিল হইতে নির্বাহ করিবে।

(ঞ) প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদসমূহ যে সকল সিদ্ধান্ত/ কার্যক্রম গ্রহণ করিবে তাহা মহাপরিচালক, শিক্ষা, বাংলাদেশ ঢাকা এবং উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রামকে অব্যাহত রাখিবে।

(ট) এই চুক্তিনামা অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা, সংক্রান্ত কোন বিষয়ে (যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/ শিক্ষিকা নির্বাচন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি) কোন বিরোধ/ সমস্যার সৃষ্টি হইলে উহা নিষ্পত্তির ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

এই চুক্তি ১লা জুলাই, ১৯৯০ইং/ ১৬ই আষাঢ় ১৩৯৭ বাংলা হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(আ: ন: ম ইউসুফ), সচিব, শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রনালয়

পর্যালোচনাঃ

(ক) শিক্ষা কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ ছুটি ও বদলী ঃ

প্রবিধানের কনং শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, জেল শিক্ষা কর্মকর্তা, তাঁর অফিসে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কেবলমাত্র জেলা পরিষদের অধীনে প্রেষণে (Deputation) নিয়োগ করা হবে। এ প্রবিধানের মূল রহস্য হলো —

(১) বাংলাদেশ সরকার উক্ত পদে যে সমস্ত বহিরাগত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করেছেন তাদেরকে কেবলমাত্র প্রেষণে জেলা পরিষদের অধীনে সমর্পন করা। বস্তুত এসব পদে জুম্মদের নিয়োগ করার কোন ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই।

(২) শর্তাবদলী 'জ' অনুচ্ছেদের মতে, কেবলমাত্র জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নৈমিত্তিক ছুটির (বৎসরে ১৫ দিন) ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীদের কোনরূপ ছুটি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। এসব ছুটির ক্ষেত্রে বর্তমান প্রচলিত সরকারী নিয়ম অব্যাহত থাকবে।

(৩) এসব শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অন্যত্র বদলীর কোন ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই। এসব কার্যাবলী উপপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ যথারীতি সম্পাদন করবেন।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ, ছুটি ও বদলী :

(১) প্রাথমিক শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে প্রচলিত নির্বাচন কমিটির পরিবর্তে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচনী কমিটি গঠিত হবে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অন্যান্য নির্দিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষক/ শিক্ষিকা নির্বাচন করবেন। লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত নির্বাচনী কমিটিতে ৬ জন সরকারী প্রতিনিধি, মাত্র ২ জন জেলা পরিষদের প্রতিনিধি —— (১) চেয়ারম্যান (২) একজন সদস্য থাকবেন। এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্য বাসীদের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নিয়োগ করার সামান্য ক্ষমতাও জেলা পরিষদকে দেয়া হয়নি।

(২) প্রাথমিক শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের ছুটি সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই।

আঠার পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

১৭ পাতার পর

(ঙ) জেলা পরিষদ কেবল মাত্র প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদেরকে উপজেলা পর্যায়ে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলি করতে পারেন। কিন্তু আন্তঃ উপজেলা পর্যায়ে (এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায়) বদলি করার কোন ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই।

(গ) প্রাথমিক স্কুল উন্নয়ন ও স্থাপন:

প্রাথমিক স্কুলের মেরামত, সম্প্রসারণ ও নূতন স্কুল স্থাপনের ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই। এসব কার্যাবলী উপজেলা পরিষদ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদন করবে। তাই এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ থেকে ক্ষমতাবান। শিক্ষা মন্ত্রনালয় ও স্থানীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে জেলা পরিষদ কেবলমাত্র স্কুল মেরামত, সম্প্রসারণ ও স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করবে।

(ঘ) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত :

এই প্রবিধানের 'ট' শর্ত মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্বাচন, নিয়োগ পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে জেলা পরিষদের সাথে সরকারের কোন বিরোধ/সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিস্পত্তির ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

শিক্ষা বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানের প্রবিধানের সর্বশেষ মর্মার্থ হলো জেলা পরিষদের হাতে কেবলমাত্র—(১) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ১৫ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান ও (২) প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের আন্তঃউপজেলা পর্যায়ে বদলির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আর, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন —জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ, ছুটি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে কোন ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই। সর্বোপরি প্রবিধানে 'ট' শর্তে উপরোক্ত দুটো ক্ষমতাও কেড়ে নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার এ যাবৎ পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে——(১) কৃষি (২) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (৩) প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। এখানে জেলা পরিষদ আইনে প্রস্তাবিত ২২টি বিষয়ের মধ্যে সামাজিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়টি পর্যালোচনা করা হলো। এতে দেখা গেল যে, জেলা পরিষদের জুম্মদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের কোন ক্ষমতা নেই। প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপজেলা বদলির ক্ষমতা কেবলমাত্র জেলা পরিষদকে দেয়া হয়েছে, যা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা/উপজেলা চেয়ারম্যান সম্পাদন করতেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো বিগত ৫/৬ মাস যাবৎ লক্ষ্মী ছড়ি উপজেলায় সামরিক কর্মকর্তারা সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। এ অবস্থাতে মহা ক্ষমতাধারী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের জনাব চেয়ারম্যান সাহেব চোখে মালা ও কানে তুলা দিয়ে বসে আছেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না বা শুনেন না। আর নানিয়াচর উপজেলায় নিজের কষ্টার্জিত মাসের বেতন তুলতে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদেরকে নানিয়াচর ক্যাম্পের কমাণ্ডারের নিকট একান্তভাবে সাক্ষাৎ করে বেতন তোলার অনুমতি আনতে হয়। এ নিয়ম

উনিশ পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

১৯ পাতার পর

অধিকারসহ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। আর যারা জেলা পরিষদ কে গ্রহণ করেছে সেই-সব সরকারী পদলেহী দালাল, স্বার্থান্ধ, সুবিধাবাদী, ক্ষমতালোভী তুলা—— — গৌতম-সমীরণ-চাছিংপ্রু সকলের প্রতি বুদ্ধিজীবিদের কোন আস্থা নেই। এসব নেতাদের অতীত ও বর্তমান গণ স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপই জেলা পরিষদকে আরো কলুষিত করেছে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দুর্নীতি ও সরকারী উচ্ছিষ্ট গম—চাল—ডাল, পারমিট ভাগাভাগির হৈ-হুল্লোড় সরল জুম্ম জনসাধারণের দৃষ্টি এড়ালেও বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। বুদ্ধিজীবিরাই সমাজের উন্নতিমূলক চিন্তাধারার ধারক বাহক। সমাজের অবনতি ও অবক্ষয়ে তাঁরা নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। সমাজের উন্নতির দিক নির্দেশনা তাঁদের কর্তব্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবি সমাজও তাই বসে নেই। তাই এবারে এগিয়ে এসেছেন ৬৭ জন বুদ্ধিজীবি। গত ডিসেম্বর/১৯৯০ পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ বাতিলের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬৭ জন বুদ্ধিজীবির (অবশ্য ক্রমিক নং ৬৮) স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিগণ এতে স্বাক্ষর করেন ও জেলা পরিষদসমূহ বাতিলের জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মোঃ শাহাবুদ্দীনের কাছে আবেদন জানান। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ১০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ৯ জন ডাক্তার, ১৪ জন ইঞ্জিনিয়ার, ২ জন স্থপতি, ২ জন কৃষিবিদ, ৪ জন ব্যবসায়ী, ৫ জন রাজনৈতিক, ২ জন ধর্মীয় পৌরহিত ১৩ জন সরকারী চাকুরীজীবি ও ১ জন স্কাউট শিক্ষক।

জেলা পরিষদ ও জুম্ম জনসাধারণ:

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত নয় দফার আলোকে প্রণত্ত জেলা পরিষদকে জনসাধারণ শুরুতেই বর্জন করেছে। এই আইন জুম্ম জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারেনি। বেদখলকৃত ভূমি ফেরৎ পাওয়ার অধিকার জনগণ পায় স্বাধীনভাবে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা পায়নি জুম্ম জনগণ। কলমপতি, পানছড়ি, বরকল, মাটিরাঙ্গা, বেলতলী ও রামবাবু ডেবা, হত্যাকাণ্ড, শত শত জুম্ম গ্রাম ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগ, হাজার হাজার নিরীহ জুম্মর নির্যাতন ও শত শত মা-বোনের ধর্ষণকে ঢাকা দিতে এ জেলা পরিষদ ষড়যন্ত্র জুম্ম জনগণের মনে প্রশান্তি দিতে পারেনি। তাই জুম্ম জনগণ জেলা পরিষদ কোন ভাবে গ্রহণ করেনি। তারা নয় দফার কর্মসূচী, মিটিং, গণ সমাবেশ বর্জন করেছে। (অবশ্য গ্রাম ঘেরাও করে অনেককে মিটিং-এ যেতে বাধ্য করা হয়েছে)। সর্বোপরি জেলা পরিষদ নির্বাচনকে বর্জন করে প্রায় ২০ হাজার জুম্ম মে—জুন ১৯৯০ ইং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এসব জুম্ম জনগণ এখনো ভারতের মাটিতে অবস্থান করছেন। আর যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়ে গেছে জেলা পরিষদ আইন তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। গ্রাম ছাড়া হয়ে গুচ্ছগ্রাম, শান্তিগ্রামে বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে তারা নির্বাচিত জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হাম্বা রবে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

জেলা পরিষদ ও ছাত্র সমাজ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজ জেলা পরিষদকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করেছে। জেলা পরিষদের অসারতা ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে ছাত্র সমাজ আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

এরপরের পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

২০ পাতার পর

তাই, প্রগতিশীল ও সংগ্রামী বিভিন্ন জুম্ম ছাত্র সংগঠন জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিবৃতি প্রদান করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে দাঁড়িয়ে গত ১৯ শে ডিসেম্বর '৯০ এবং ৯ই জুলাই '৯১ জুম্ম ছাত্র সমাজ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে পার্বতা জেলা পরিষদ বাতিলের দাবী জানিয়েছেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে ছাত্র ডেপুটেশন দিয়েছে। চট্টগ্রামে মিলন চত্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ পরিষদের পতাকাতলে পার্বতা জেলা পরিষদ বাতিলে অংশ নিয়েছে। খাগড়াছড়ি শহরে জেলা পরিষদ বাতিলের দাবীতে মিছিল ও গণবিক্ষোভের আয়োজন করেছে। জুম্ম ছাত্র সমাজের একমাত্র সংগঠন--বৃহত্তর পার্বতা চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জেলা পরিষদ বিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

জেলা পরিষদ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তির্গ সুকৌশলে বর্জন করেছেন। নব দশা কর্মসূচীর ধ্বজাধারী (পরিষদের সুযোগ সন্ধানী বর্তমান চুক্তিগোষ্ঠীদের মতো তারা জেলা) পরিষদের ভোগে প্রলুব্ধ হননি। অনেকে সে ব্যাপারে সাধ্যমত নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। কারণ অগণতান্ত্রিক ও সামরিক জেনারেলদের যুগে তাঁরা খুবই অসহায় ছিলেন। নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ছাড়া তাঁদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। এসব ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, বোমাং রাজা মং চৈ প্রু চৌধুরী, প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রী চাথোয়াই রোয়াজা ও শ্রী মতি সুদীপ্তা দেওয়ান এবং রাষ্ট্রপতির উপজাতি বিষয়ক প্রাক্তন উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ান। একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা জেলা পরিষদ আইন বর্জন করে জেলা পরিষদ নির্বাচনের পূ[র্ব] মহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ[্যে] আশ্রয় নিয়েছেন।

এছাড়া প্রগতিশীল ও তরুণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমন্ব[য়ে] গঠিত পার্বতা চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ পরিষদ জেলা পরি[ষদ] বাতিলের দাবীতে চট্টগ্রাম মিলন চত্বরে এক গণ সমাবে[শ] সাংবাদিক সম্মেলন ও মিছিলের আয়োজন করেছে।

পার্বতা চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টের ১১৩ পৃষ্ঠার ৩ চড়ান্ত সিদ্ধান্তে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে জেলা পরিষদের এক নির্বাচিত সদস্য এক গোপনীয় যোগাযোগের মাধ্যমে জে[লা] পরিষদের বিরুদ্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন!

জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্ট

জেলা পরিষদসমূহ সম্বন্ধে পার্বতা চট্টগ্রাম কমিশ[নের] সর্বপ্রথম মন্তব্য সবচেয়ে প্রনিধানযোগ্য। রিপোর্টের পৃষ্ঠার শুরুতেই লেখা হয়েছে——— The legislation es[ta]blis ing the district councils is routine local [gov]ernment legislation, concerned with electi[on,] administration, and process. The legislat[ion] states no goals, recognize no rights and r[elies] on regular Bangladesh government offici[als to] supervice the processes of the district coun[cils.] অর্থাৎ জেলা পরিষদ আইনসমূহ হলো স্থানীয় সরকারী [আইন] যা নির্বাচন, শাসন ও প্রক্রিয়াসমূহ রীতিমত সম্পাদন [করে।] এই আইনসমূহের কোন লক্ষ্য নেই, কোন অধিকারের [স্বীকৃতি] নেই এবং জেলা পরিষদ সমূহের প্রক্রিয়া পদ্ধতি বাং[লাদেশ] সরকারী কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানের উপর নির্ভরশীল। রি[পোর্টে] আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেলা পরিষদ অধিবেশন সমূহের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ[ের] জন্য প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসককে জেলা পরিষ[দের] সেক্রেটারী করা হয়েছে। জেলা পরিষদসমূহের কার্যক্র[মে সর]কারী সত্ত্বাবধান অব্যাহত রয়েছে এবং জেলা পরিষদ

বাইশ পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

১০ পাতার পর

তাই প্রগতিশীল ও সংগ্রামী বিভিন্ন জুম্ম ছাত্র সংগঠন জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিবৃতি প্রদান করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে দাঁড়িয়ে গত ১৯শে ডিসেম্বর '৯০ এবং ৯ই জুলাই '৯১ জুম্ম ছাত্র সমাজ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিলের দাবী জানিয়েছেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে ছাত্র ডেপুটেশন দিয়েছে। চট্টগ্রামে মিলন চত্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ পরিষদের পতাকাতলে পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিলে অংশ নিয়েছে। খাগড়াছড়ি শহরে জেলা পরিষদ বাতিলের দাবীতে মিছিল ও গণবিক্ষোভের আয়োজন করেছে। জুম্ম ছাত্র সমাজের একমাত্র সংগঠন--বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জেলা পরিষদ বিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

জেলা পরিষদ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সুকৌশলে বর্জন করেছেন। নয় দফা কর্মসূচীর ধ্বজাধারী (পরিষদের সুযোগ সন্ধানী বর্তমান সুবাগোষ্ঠীদের মতো তারা জেলা) পরিষদের তোপে প্রফুল্ল হননি। অনেকে সে ব্যাপারে সাধ্যমত নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। কারণ অগণতান্ত্রিক ও সামরিক জেনারেলদের যুগে তাঁরা খুবই অসহায় ছিলেন। নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ছাড়া তাঁদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। এসব ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, বোমাং রাজা মংচৈ প্রু চৌধুরী, প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রী চাথোয়াই রোয়াজা ও শ্রীমতি সুদীপ্তা দেওয়ান এবং রাষ্ট্রপতির উপজাতি বিষয়ক প্রাক্তন উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ান। একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা জেলা পরিষদ আইন বর্জন করে জেলা পরিষদ নির্বাচনের পূর্ব মহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন।

এছাড়া প্রগতিশীল ও তরুণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ পরিষদ জেলা পরিষদ বাতিলের দাবীতে চট্টগ্রাম মিলন চত্বরে এক গণ সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলন ও মিছিলের আয়োজন করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টের ১১৩ পৃষ্ঠার ৩ নং চড়ান্ত সিদ্ধান্তে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, জেলা পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য এক গোপনীয় যোগাযোগের মাধ্যমে জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন!

জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্ট

জেলা পরিষদসমুহ সম্বন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সর্বপ্রথম মন্তব্য সবচেয়ে প্রনিধানযোগ্য। রিপোর্টের ৩১ পৃষ্ঠার শুরুতেই লেখা হয়েছে---The legislation establis ing the district councils is routine local government legislation, concerned with elections, administration, and process. The legislation states no goals, recognize no rights and relies on regular Bangladesh government official to supervice the processes of the district councils, অর্থাৎ জেলা পরিষদ আইনসমুহ হলো স্থানীয় সরকারী আইন যা নির্বাচন, শাসন ও প্রক্রিয়াসমুহ রীতিমত সম্পাদন করা। এই আইনসমুহের কোন লক্ষ্য নেই, কোন অধিকারের স্বীকৃতি নেই এবং জেলা পরিষদ সমুহের প্রক্রিয়া পদ্ধতি বাংলাদেশ সরকারী কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানের উপর নির্ভরশীল। রিপোর্টে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেলা পরিষদসমুহের অধিবেশন সমূহের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসককে জেলা পরিষদসমুহের সেক্রেটারী করা হয়েছে। জেলা পরিষদসমুহের কার্যক্রমে সরকারী সত্ত্বাবধান অব্যাহত রয়েছে এবং জেলা পরিষদ আইনের

বাইশ পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

১১ পাতার পর

৫০, ৫১, ৬১, ৬৮, ও ৬৯ ধারায় সরকার জেলা পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করতে পারে।

জেলা পরিষদ সমূহের নির্বাচনের ভোট পদ্ধতি সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যেহেতু প্রত্যেক উপজাতি ও অউপজাতি সদস্যকে উপজাতি ও অউপজাতি উভয়ের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়, তাই এই ভোট পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো উপজাতি ও অউপজাতিদের সহাবস্থানে বাধ্য করা। এর অর্থ হলো ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। (The structure of the CHT District Council voting system can be described as favouring accommodation and co-existence. It can also be described as accepting the Bengali settlers as a continuing or permanent part of the peoples of the CHT.)

পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যাবলী সম্বন্ধেও রিপোর্টে সংক্ষিপ্তভাবে বিবরণ দেয়া হয়েছে। এইসব কার্যাবলীর প্রেক্ষিতে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, The District Councils are to provide local government services, develop infrastructure and promote economic development. অর্থাৎ জেলা পরিষদেসমূহের কাজগুলো স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী সম্পাদন, অবকাঠামো ও অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা। কমিশনের সদস্যদের নিকট একজন জেলা শাসক জেলা পরিষদসমূহকে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। One Deputy Commissioner described the district council as primary concerned with development.

রিপোর্টে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভূমি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ভূমি নিয়ন্ত্রণে জেলা পরিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধে কমিশন কোন চূড়ান্ত উত্তর পায়নি। যেহেতু ভূমি স্থানান্তর সম্বন্ধে জেলা পরিষদ আইনের ৬৯ ধারা——জেলা পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন বহিরাগতকে (Non-resident) ভূমি স্থানান্তর করা যাবে না——এর প্রেক্ষিতে কমিশন স্পষ্টভাবে বলেছে যে, এটা বাঙ্গালী বসতিস্থাপন বন্ধ করার একটা আইন মাত্র, যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের প্রবেশ বন্ধের কোন প্রত্যক্ষ বাঁধানিষেধ নেই। (This is simply a further tightening of rules designed to further Bengali settlement, while still avoiding a direct prohibition on Bengali movement into the hills.)

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের ভূমি বেদখল সম্বন্ধে কমিশনের রিপোর্টে দেখা গেছে যে, ত্রিপুরার শরণার্থীরা অনুপ্রবেশকারী কর্তৃক তাদের ভূমি বেদখলের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন ভূমি বেদখলের প্রমাণ রিপোর্টে উত্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারী কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের সরকারী কর্মকর্তাদের অস্বীকৃতিতে কমিশন বিস্ময়াভিভূত হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তাদের এই অস্বীকৃতিকে অবিশ্বাস্য হিসাবে মন্তব্য করা হয়েছে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধিজীবি

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানকল্পে এবছর সরকারের গৃহিত জেলা পরিষদ আইন সম্পর্কে বাংলাদেশের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও দেশবাসীর নিকট পরিস্কৃত হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যা সম্পর্কে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন এবং ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফাকে জোরালো সমর্থন জানিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। গত ৯ই জুলাই ১৯৯১ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে পুনরায় পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিলসহ ছাত্র পরিষদের ৫দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন বাংলাদেশের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ।

তেইশ পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

২২ পাতার পর

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি সমাজ পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কে তাঁদেব সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধিজীবিদের মতামত জানার জন্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগরী শাখা এক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ৫ জন বুদ্ধিজীবির নিকট হতে ৯টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নমালার উত্তরপত্র সংগ্রহ করেছে। এসব প্রশ্নাবলীর মধ্যে ৬নং প্রশ্নটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ এবং বাংলাদেশের অপরাপর জেলা পরিষদের মধ্যে গঠনতন্ত্র ছাড়া তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। অথচ এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের আসল প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে জেলা পরিষদ চাপিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের অপপ্রয়াস চালান। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বিচারপতি কে, এম, সোবহান চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানে ও বিরোধী দলগুলি একত্রিত হয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং দেশের ethnic সংখ্যালঘুদের দাবীদাওয়া সংবিধান এবং অন্যান্য আইনের মাধ্যমে মেটাতে হবে। এর জন্য তিনি সরকারী প্রতিনিধি, বুদ্ধিজীবি ও ethnic সংখ্যালঘুদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জনসমক্ষে এনে তার আইন সংগত সমাধানের কথা বলেন।

ডঃ আহমদ শরীফ (ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন "এটা যেমন ধরুণ না এই যে, সামরিক সরকার জঙ্গী সরকার এবং তিনি ছিলেন সেনানী নায়ক। তিনি বুদ্ধি করে ও ওদের সরলতার সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ সন্তুষ্ট হয়নি। তারা এখনো সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সেটা বাতিল করে দিয়ে এখনকার বেসামরিক সরকার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করবে। এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা"।

ড সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন, "জেলা পরিষদ চাপিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি"।

স্থপতি মাজহারুল ইসলাম (ভূতপুর্ব অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্বঃ) বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সমস্যা পৃথকভাবে বিবেচনা করেই এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসীদের মতামতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রশাসনিক নিয়ম কানুন আইন ও বিধি প্রণয়ন করা বাঞ্চনীয়।"

জনাব আনু মোহাম্মদ (সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঁঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন, "যেভাবে জেলা পরিষদ করা হয়েছে তাতে পার্বত্য জনগণকে বরঞ্চ প্রতারণা করা হয়েছে। জেলা পরিষদ অবশ্যই বাতিল করতে হবে এবং অঞ্চলের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করাতে হবে। সেখানে অঞ্চলের বসবাসরত দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ভূমিকা থাকবে প্রধান ও নির্ধারক।"

জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানত্রয়ের নরম সুর

গণধিকৃত, অগণতান্ত্রিক, স্বশাসনের প্রহসন, অনুপ্রবেশকারীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের সনদ ও জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার নীলনকশা পার্বত্য জেলা পরিষদকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জুম্ম জনগণ কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারেনি তাই জুম্ম জনগণ প্রথম থেকেই জেলা পরিষদ সম্পর্কিত আলোচনা, মিটিং প্রচারনাসহ জেলা পরিষদ নির্বাচন বর্জন করেছে। ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জেলা পরিষদকে বাতিলের দাবীসহ থাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম ও ঢাকায় মিছিল করেছে। জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে এই গণ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানত্রয়ের নরম সুর পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত ১৯শে জুন রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয় বৈঠকের পর তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানত্রয়ের যুক্ত ঘোষনায় তাদের নয়মসুর সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাদের ঘোষনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে যে কোন শুভ উদ্যোগ গৃহিত হলে তাকে স্বাগত জানানো হবে। জেলা

চব্বিশের পাতায়

পরিষদ সমূহের হালচাল

২৩ পাতার পর

পরিষদ গ্রহণের সময় তাদের জোরালো বক্তব্য ছিল - জেলা পরিষদই পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র সমাধান। কিন্তু জেলা পরিষদ গঠনের দু'বছর পর তারা বুঝতে পেরেছেন, জেলা পরিষদ গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের অবস্থা (সমস্যা) আরো জটিলতর হয়েছে। জুম্মদের ধ্বংস আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের লেজুরগিরি ও দুলাবৃত্তি জন সমর্থনকে গুণের কৌটায় নিয়ে গেছে। তাঁরা আজ জনগণের ঘৃনার পাত্র। জুম্ম জাতির নিকট বিশ্বাসঘাতক। যেহেতু জুম্ম জনগণ মনে করে যখন বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সমঝোতার আলোচনা হচ্ছে এই আলোচনা বানচাল করে জনসংহতি সমিতিকে পাশ কাটিয়ে ক্ষমতার দুলা কাঁধে তুলে নিতে এগিয়ে আসে এসব দালালরা। তাঁরা জুম্ম জনগণের স্বার্থকে প্রতারণা করে সামরিক জেনারেলদের ফুসলিয়ে তড়িঘড়ি করে সংসদে পাশ করিয়ে নেয় জেলা পরিষদ আইন। কিন্তু দু'বছর পর জেলা পরিষদের ক্ষমতার স্বাদে এখন অম্লত্ব ও তিক্ততা এসে গেছে। ছাত্র জনতার বিজয়ী রূপ তাঁদের প্রাণে কাঁপুনির উদ্রেগ করেছে। গত ৯/৭/৯১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সম্মেলনে গৃহিত ৫ দফা দাবীর প্রেক্ষিতে ফাস্ট বিবিসির সাংবাদিক আতাউস সামাদের এক প্রশ্নের জবাবে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বলেছেন, জেলা পরিষদ অপেক্ষা গ্রহণযোগ্য যে কোন প্রস্তাবকে তিনি স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব অবস্থাকে অনুধাবনের বহিঃপ্রকাশ।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, জেলা পরিষদ আইনকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ, ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবি কেহই গ্রহণ করেনি। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল আবদুল সালাম ও খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কম্যাণ্ডার কর্ণেল মুহম্মদ ইব্রাহিম এর স্বশাসন প্রদানের নীলনকশা নয় দফার আলোকে বর্তমান পার্বত্য জেলা পরিষদ জোর করে জুম্ম জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানের ভাওতা দিয়ে বিশ্ব বিবেককে বিভ্রান্ত করার এক অপচেষ্টা এই জেলা পরিষদ। ১৯৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, চংড়াছড়ি, মাটিরাঙ্গা রামবাবু ডেবা হত্যাকাণ্ড, শত শত জুম্ম ভূমি বেদখলকে ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা এই জেলা পরিষদ আইন। জেলাপরিষদ আইনের ফলে ২০ হাজার জুম্মকে ভারতে আশ্রয় নিয়ে হয়েছে। হাজার হাজার হাজার জুম্ম আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম ও শান্তিগ্রামে বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, হাজার হাজার জুম্ম পরিবার এখনো বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ জেলা পরিষদকে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে সংগ্রাম রত জনসংহতি সমিতি শুরুতেই প্রত্যাখ্যান করেছে।

স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সুপ্রভাত বইতে শুরু করেছে। এই সুযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, আপামর জনগণ আজ তাদের কাঁধে চেপে থাকা জেলা পরিষদ আইনকে ঝেড়ে ফেলতে সোচ্চার হয়েছে। জুম্ম জনগণ আজ তাদের পুঞ্জিভূত ক্রোধানল প্রজ্বলিত করতে শুরু করেছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের নিকট তাদের জেলা পরিষদ নাটকের দৃশ্যাবলী তুলে ধরতে দ্বিধাবোধ করেনি। আজ বাংলাদেশ ও বিশ্বের জুম্ম হিতৈষী, মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক জনগণের কাছে এটা স্পষ্ট যে, জেলা পরিষদ আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে আরো জটিল করেছে। জুম্মদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আরো অনিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের বেসামরিক সরকারী প্রশাসনের উপর সামরিক উর্দি পরা জেনারেলদের খবরদারী করার পথকে আরো প্রশস্থ করেছে। বাংদেশের সরকার জুম্মদের বিরুদ্ধে এক অমানবিক জঘন্য যুদ্ধে দিন দিন জড়িয়ে পড়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এহেন নাজুক পরিস্থিতি জুম্মদের কারো কাম্য নয়। জুম্ম জনগণ চায় তাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের গ্যারান্টি। জেলা পরিষদ জুম্মদেরকে এই গ্যারান্টি দিতে পারেনি। তাই জুম্ম জনগণ আজ জেলা পরিধদ নামক কালো আইন চুরমার করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে অটল ও অবিচল।

সরকারী প্রহসন

১২ পাতার পর

ডি পি পোষ্ট হতে মাত্র ৩০০- ৪০০ গজ দূরত্বে যেখানে ভি ডি পি দের জুতার ছাপ ও বিড়ির শেষাংশ পাওয়া গিয়েছিল। প্রতিবেদক এসব কিছু একেবারে এড়িয়ে গেছেন নিজের নিরাপত্তার খাতিরে। বস্তুতঃ এই তথ্যগুলি স্বয়ং পিতাদ্বয় উল্লেখ করতে সাহস করেনি। আর প্রতিবেদক বা উল্লেখ করবেন কোন সাহসে? সর্বশেষে প্রতিবেদক বিভিন্ন যুক্তির অবতাড়না করেছেন বাঙ্গালীরা এই ঘটনায় জড়িত নয় এ সুবাদে—— (১) বাঙ্গালীরা এই হত্যাকাণ্ড করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বেশী। (২) হত্যাকাণ্ডগুলি যৌনবিকৃত প্রসুত নয়। (৩) বাঙ্গালীরা নিরাপত্তা পোষ্টের কাছে এ হত্যাকাণ্ড করতে সাহস পেত না। (৪) হত্যাকাণ্ডটি জাতিগত প্রতিহিংসাপ্রসুত নয়, কারণ বাঙ্গালী ও উপজাতীয়দের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। (৫) হত্যাকাণ্ডটি মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ সৃষ্টি করার অপপ্রয়াসের সন্দেহ রাখে। (৬) এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। সন্ত্রাসীদের তৎপরতা অনেক কমে গেছে। তাই পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য হতে পারে।

কিন্তু ধর্মের ঢোল আপনি বাজে। সত্য কখনো গোপন থাকে না। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে প্রশাসন ও অনুপ্রবেশকারীরা যত মিথ্যা ছলনা ও প্রহসনের আশ্রয় নিক না কেন আজ সকল জুম্ম জেনে গেছে এ হত্যাকাণ্ডের নায়ক কারা ও কিভাবে কিশোরীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। কিশোরীদের ফুটন্ত রূপযৌবনই তাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল। সেদিন কোন বাঙ্গালী মুসলমান কিশোরীদের উপস্থিতির খবর দিয়েছিল ১০নং নিরাপত্তা পোষ্টের ভিডিপিদেরকে যেখানে আট জন ভিডিপি পাহাড়ারত ছিল। এ ভিডিপি সদস্যরা কিশোরীদেরকে উপর্যোপরি ধর্ষণ করে তাদের পাশবিক কামনা চরিতার্থ করে ও শেষে গলা কেটে হত্যা করে। ভিডিপিরা ধর্ষনের স্বাক্ষী রাখে কিশোরীদেরকে স্তন ও মুখে দাঁতের ক্ষত চিহ্ন বসিয়ে আর ঘটনাস্থলে তাদের জুতার ছাপ ও বিড়ির শেষাংশ ফেলে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ময়না তদন্তে ডাক্তারগণ কিন্তু এসব তথ্যের কোনটাই উল্লেখ করেননি। জুম্ম নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জুম্মগণও এ ব্যাপারে উচ্চ বাচ্য করতে পারেনি। যেহেতু খড়গ উত্তোলিত জল্লাদের সম্মুখে নিরব থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কিন্তু ১০নং নিরাপত্তা পোষ্টের পাহাড়ারত ভিডিপিদেরকে অন্যত্র সরিয়ে হত্যাকারীদের নজিরবিহীন শাস্তির উপমা সৃষ্টি করেছেন। ভিডিপিদের পাশবিক লালসার মুখে ৩জন জুম্ম কিশোরী ও ১০ বৎসরের সতীশ কুমারকে প্রাণ দিতে হলো। প্রহসনের নাটকে বাঙ্গালী মুসলমানদের মিথ্যার বেসাতি ও জুম্মদের করুণ অসহায়ত্ব প্রত্যক্ষ করলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজ। এ রকম শত শত ঘটনা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে করছে আর দোষ চাপাচ্ছে শান্তি বাহিনীর উপর।

—

জুম্ম গৃহে অগ্নিসংযোগ

খাগড়াছড়ি, গত ২রা আগষ্ট তারিখে যাদুরাম পাড়া আর্মি ক্যাম্পের (৩৫ বেঙ্গল) লেঃ সাইফুর রহমান জর্দানের নেতৃত্বে একদল আর্মি যাদুরাম পাড়া নিবাসী শ্রী কুন্তী কুমার ত্রিপুরার (৫৫) পীং মৃত ধনা রাম ত্রিপুরা আজাছড়াস্থ খামার বাড়ীটি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত করে দেয়।

গত ৬ই আগষ্ট তারিখে উক্ত যাদুরাম পাড়া আর্মী ক্যাম্পের (৩৫ বেঙ্গল) লেঃ সাইফুর রহমান জর্দান আবার ৩৫/৪০ জন আর্মী নিয়ে বেতছড়ি মুখ দাঁতভাংগা ছড়াস্থ (খাগড়াছড়ি) ৩টি জুমঘর পুড়ে ছাই করে দেয় এবং জুম্মদেরকে পার্শ্ববর্তী গুচ্ছগ্রামে যেতে নির্দেশ দেয়। এতে ক্ষতিগ্রস্থ জুম্মরা ইটছড়ি গ্রামে আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ জুম্মরা হচ্ছে —

১। শ্রীবিন্দু কুমার চাকমা (৩৫) পীং মৃত প্রফুল্ল চন্দ্র চাকমা গ্রাম—দাঁতভাংগা ছড়া, ইটছড়ি মৌজা। ক্ষতি—আনুমানিক ৫০০০/— টাকা।

২। শ্রী ফজল চাকমা (৩১) পীং মৃত প্রফুল্ল চন্দ্র চাকমা, গ্রাম—দাঁতভাংগাছড়া, ইটছড়ি মৌজা। ক্ষতি—৫০০০/- টাকা।

৩। শ্রী ভারত মোহন চাকমা পীং পুণ্য সেন চাকমা, গ্রাম দাঁতভাংগা ছড়া, ইটছড়ি মৌজা। ক্ষতি—৫০০০/- টাকা।

—

প্রতিনিধিত্বহীন জাতি সমূহের নতুন সংগঠন আনপোর (UNPO) সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির অংশ গ্রহণ

বিশ্বে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারহীন কিন্তু অধিকার আদায়ে সংগ্রামরত জাতিসমূহের এক নতুন সংগঠন আনপো (**Unrepresent-ed Nations and peoples Organisation**) আত্মপ্রকাশ করেছে। গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ইস্তোনিয়ার টারটু (Tartu) শহরে আনপো'র প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রস্তুতিমূলক সভার সিদ্ধান্তক্রমে গত ফেব্রুয়ারী মাসে নেদারল্যাণ্ডের হেগ শহরে আনপো গঠিত হয়। এটাই আনপো'র প্রতিষ্ঠা সম্মেলন। এই সম্মেলনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ নির্বাচিত হন।

চেয়ারম্যান- ডঃ লিনার্ট মল (**Dr Linart Mold**) (ইস্তোনিয়া,) ভাইস চেয়ারম্যান ইরকিন আলপটেকিন **Eirkin Alptekin**) পূর্ব তুর্কিস্থান) স্টিয়ারিং কমিটির প্রেসিডেন্ট লোডী জি গীয়ারী (**Lodi G Gyari**) (তিব্বত), সাধারণ সম্পাদক ডঃ মাইকেল জি ভন ওয়াল্টভন প্রাগ (**Dr. Michal G Van waltvan prag**)

আনপো'র দ্বিতীয় সম্মেলন গত ৩—৭ই আগষ্ট হেগ শহরের **Centurm Contractder Kontinenter, Soost-erbirg** এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে জন সংহতি সমিতির মুখপাত্র ডঃ আর এস দেওয়ান, চাকমা রাজ কুমারী শ্রীমতি চন্দ্রা রায় যোগদান করেছেন। এতে "আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সংগ্রামরত জাতি সমূহের দমনে সরকারী বাহিনী ব্যবহার" বিষয়ে এক সাধারণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারী প্রতিনিধিরাও এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এ সম্মেলনে আনপো'র মনোগ্রাম ও পতাকা প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী জাতি সমূহের নিকট হতে আনপো'র মনোগ্রাম ও পতাকার নমনা পাঠানোর অনুরোধ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকেও এই মনোগ্রাম ও পতাকা নির্বাচনী প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে অনেক জাতি ও সংখ্যালঘু জাতি রয়েছে, যাদের জাতি সংঘের প্রতিনিধিত্ব নেই, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নেই, স্বদেশে পরবাসী অথবা বিদেশে শরণার্থী, দেশে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচিত, মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং সরকারের অত্যাচার, নিপীড়ন ও হত্যার শিকার হচ্ছে, এসব জাতি সমূহের পক্ষে জাতি সংঘ ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হচ্ছে এ আনপো (UNPO)। তিব্বতীয়, বাল্টিক রাষ্ট্র সমূহ, পূর্ব টাইমুরীয়, পশ্চিমী পাপুয়ান, অন্তর মঙ্গোলিয়ার মঙ্গোলগন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতি, পশ্চিম সাহারীয় ইারস্ট্রিয়ান, আলবেনিয়ার গ্রাক সংখ্যালঘু, আমেরিকার আদি বাসী, কানাক্স, ইউইগুরস্ Uighurs), আর্মেনীয় কুর্দি, কোসোভো'র (Kosevo) আলবেনীয় ইত্যাদি জাতি ও রাষ্ট্র সমূহ আনপোতে স্থান পাবে। উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশ থেকে কেবল মাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আনপো'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নেদারল্যাণ্ডের রাজনীতিবিদগণ এবং প্রচার মাধ্যম ব্যাপক উৎসাহ ও সমর্থন জানাচ্ছেন। ফলে হেগ শহরের মূল কেন্দ্রে অবস্থিত এ্যামবেসি এলাকার একটি সম্মানজনক ভবনে আনপো'র আন্তর্জাতিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করার হেগের নগর সরকার এর প্রস্তাব আনপো বিবেচনা করছে। ডেনমার্কের পররাষ্ট্র দপ্তরও আনপোকে সমর্থন দিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে। উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনকে তার তদন্ত কাজ চালাতে এই পররাষ্ট্র দপ্তর ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) মার্কিন ডলার বরাদ্ধ করেছিল।

—

শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র অভিযান

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে সংগ্রামরত শান্তিবাহিনী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও অনু প্রবেশকারীদের উপর সশস্ত্র অভিযান অব্যাহত রেখেছে। গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে পরিচালিত কয়েকটি অভিযানের বিবরণ দেয়া হল।

গত ১৬ জুলাই বিলাইছড়ি উপজেলাসস্থ শলকা পাড়ায় টহলরত একদল বাংলাদেশ সেনার উপর হামলা চালিয়ে শান্তিবাহিনীর জোয়ানেরা ১ জন সেনাকে হত্যা ও ২ জনকে আহত করেছে। এই আক্রমণে বাংলাদেশ সেনারা পালিয়ে যায় এবং শান্তিবাহিনীর জোয়ানরা ১টি এস এম জি (চাইনীজ) ও ২টি হাত বোমা (গ্রেনেড) দখল করে নেয়।

২৮ শে জুলাই, অযাং ছড়িতে (বরকল) শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আচমকা আক্রমণ চালিয়ে ৭ জন বাংলাদেশ সেনাকে হত্যা করেছে। সেনাবাহিনীর উপর সর্বশেষ আক্রমণটি করা হয় ১৭ আগষ্টে একই উপজেলার গণ্ডাছড়ায়। এই আক্রমণে ২জন সেনা গুরুতর ভাবে আহত হয়।

এ ছাড়া শান্তিবাহিনীর আক্রমণে ২১ জন অনুপ্রবেশকারী নিহত ও ১৯ জন আহত হাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। অনুপ্রবেশকারীদের উপর আক্রমণের ঘটনাগুলো হচ্ছে ঃ—

৫ই জুলাই	বেতছড়ি (হাগড়াছড়ি)	২জন নিহত	২জন আহত
১৫ই জুলাই	মাচ্চুয়াবিল (লংগদু)	৩জন নিহত	২জন আহত
২৩শে জুলাই	গুলশাখালী (লংগদু)	৭জন নিহত	৩জন আহত
৫ই আগষ্ট	ইছামতি (কাউখালী)	২জন নিহত	৩জন আহত
৯ই আগষ্ট	রাংগাপানি (বেরু, দীঘিনালা	১জন নিহত	৩জন আহত
১১ই আগষ্ট	ঘনমোর (বরকল)	৩জন নিহত	১জন আহত
১৮ই আগষ্ট	গুলশাখালী (লংগদু)	২জন নিহত	১জন আহত
২১শে আগষ্ট	মারিশ্যা বাজার (বাঘাইছড়ি)	১ জন নিহত	৪ জন আহত

লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ

১০ এর পাতার পর

২৫শে আগষ্ট, দুরছড়ি (কাচালং) ক্যাম্প কম্যাণ্ডার ক্যাঃ মেজবা উদ্দীন (২৮ বেঙ্গল) উত্তর পাবলাখালী গ্রামে এক অভিযান চালিয়ে ১০ জন নিরীহ জুম্মকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত জুম্মদেরকে ক্যাম্পে বর্বোরচিত ভাবে নির্যাতন করা হয়। এরা হচ্ছে ঃ— ১। নিহার বিন্দু চাকমা (২১) পীং দয়াল চাকমা ২। রূপায়ন চাকমা (১৯) পীং ভুবন চাকমা, ৩। গুয়ানট চাকমা (২০) পীং শুক্রমনি চাকমা, ৪। নীল রঞ্জন চাকমা (৫৫) পীং চন্দ্র সুখ চাকমা, ৫। বিংশ কুমার চাকমা পীং ইন্দ্র সেন চাকমা, ৬। বকুল কান্তি চাকমা (২১) পীং সুমতি চাকমা, ৭। নিরুপম চাকমা (৪০) পীং কালিনী চাকমা ৮। জ্ঞান কুমার চাকমা (৪০) পীং সুরেন্দ্র চাকমা, ৯। কান্তি বিকাশ চাকমা (২৪) পীং জ্ঞান কুমার চাকমা, ১০। মহারাজ চাকমা (১৮) পীং মঙ্গাগালা চাকমা। উপরোক্ত ১—৩ ব্যক্তিকে শান্তিবাহিনী অভিযোগে রাঙ্গামাটিতে চালান দেয়া হয়েছে। অন্যান্যদেরকে দুইদিন নির্যাতনের পর ছেড়ে দেয়া হয়।

৪-৯-৯১ ইং তারিখে দিবাগত রাত্রে বাঘাইছড়ি নিবাসী শান্তি বিকাশ চাকমা, পীং বাঘা চাকমা মারিশ্যা ক্যাম্পের সেনারা মারিশ্যা আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেয়া হয়নি।

—

নারী অপহরণ ব্যর্থ

১১ পাতার পর

কাউখালী উপজেলা। তাকে তোতা নামের জনৈক পুলিশ অপহরণের চেষ্টা করে।

২) শ্রীমতি পেকল্লে চাকমা (১৭) পীং শান্তি কুমার চাকমা, গ্রাম—তালুকদার পাড়া, ১০১ নং ঘিলাছড়ি মৌজা, কাউখালী উপজেলা। তাকে সেলিম নামে জনৈক পুলিশ অপহরণের চেষ্টা করে।

৪) শ্রীমতি কাবালি চাকমা (১৬) পীং শান্তি জীবন চাকমা, গ্রাম—ঘিলাছড়ি, ১০১ নং ঘিলাছড়ি মৌজা, কাউখালী। তাকে. জাহাঙ্গীর নামে জনৈক পুলিশ অপহরণের চেষ্টা করে।

—

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

১০ পাতার পর

এছাড়া গত ৯ই জুলাই বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রথমে কেন্দ্রীয় সম্মেলনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, পাহাড়ী জনগণ ও বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ব-দ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ; জেলা পরিষদ গঠনের পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে বিরাজিত সমস্যার উপর তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। উভয় বুদ্ধিজীবি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে জন্য বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক পেশাজীবি, গণতান্ত্রিক শক্তি ও পার্বত্য বাসীদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। এ আলোচনা অনুষ্ঠানে জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আনুমোহাম্মদও বক্তব্য রাখেন। (জুম্ম ছাত্র সম্মেলন ও সেমিনার : জুম্ম সংবাদ বুলেটিন, ৩য় সংখ্যা)।

বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টির নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান গণতন্ত্রের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। গত ৬-১-৯১ ইং তারিখে নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পার্টির চট্টগ্রাম জেলা কমিটির এক সভায় উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন অমৃত বড়ুয়া, শরীফ শমসির ও নাসির উদ্দীন আহম্মদ। সভায় এক প্রস্তাবে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও গণ পরিষদের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বলা হয়, পার্বত্য এলাকার জেলা পরিষদগুলো অবিলম্বে বাতিল করে একটি রাজনৈতিক কমিশন গঠন করা হোক। কমিশন রাজনৈতিকভাবে এই সমস্যার সমাধানের সুপারি করবে। (দৈনিক বাংলার বানী, ৭-১-৯১ ইং)

ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবীর মধ্যে প্রথম দাবীটা সবচেয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ৫ দফার বিরুদ্ধে যারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাঁরা প্রধানত এ দাবীটার বিরোধীতা করেছেন। পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কে পার্বত্য যুব ও সংহতি সংঘ কর্তৃক এপ্রিল ১৯৮৯ ইং সনের ঐতিহ্যবাহী মহান বিজু (সাংগ্রাই, বৈসুক) ও নববর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত এক বুকলেটে। সেই বুকলেটে জেলা পরিষদকে নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

(১) জেলা পরিষদ জাতীয় সংসদে কেবলমাত্র পার্লামেন্টারী আইন হিসাবে পাশ হয়েছে। রাষ্ট্রিয় সংবিধানে এ আইন অন্তর্ভূক্ত হয়নি। তাই জেলা পরিষদের কার্যকারিতাও মেয়াদ অত্যন্ত ক্ষনস্থায়ী। সরকার যেকোন মুহূর্তে এ আইন বাতিল করতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই।

(২) ১৯০০ সালের হিল ট্রেকটস ম্যানুয়েল এর অনেক উপযোগী ধারার মতো Land Right ও জেলা পরিষদের ফলে বাতিল হয়েছে। জেলা পরিষদের বেআইনী অনুপ্রবেশকারী দের বহিস্কার ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কোন ক্ষমতা নেই।

(৩) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজাতীয় হবার বিধান থাকলেও এতে রয়েছে প্রচুর বিভ্রান্তি ও ত্রুটি। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় বলে তাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও মদত ছাড়া কোন জুম্ম জনগণের পক্ষে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়।

(৪) দেশের অন্যান্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের ডেপুটি মিনিষ্টারের মর্যাদা দেয়া হবে। অথচ পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক শপথ গ্রহণ করানো হয়।

(৫) সর্বোপরি জেলা পরিষদ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ও বানরবান তিনভাগে বিভক্ত করে উপনিবেশিক কায়দায় শাসন শোষন চালানো। মুষ্টিমেয় কিছু জুম্মকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভাগ দিয়ে ব্যাপক জনসাধারণকে দমিয়ে রাখার অপকৌশল।

জনসংহতি সমিতির ৫ দফা ও ছাত্র পরিষদের ৫ দফার মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি ?

জনসংহতি সমিতির ৫ দফার মূল দাবীগুলো হলো— (১) পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান, (২) এই প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদান, (৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী দেরকে বহিষ্কার ও জুম্মদের সুষ্ঠু পনর্বাসন, (৪) জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রদান এবং (৫) পার্বত্য

উনত্রিশ পাতায়

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

২৮ পাতার পর

চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা।

জনসংহতি সমিতির এ ৫ দফার সাথে ছাত্র পরিষদের ৫ দফার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয়ের ৫ দফার মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। জনসংহতি সমিতির দাবী অত্যন্ত ব্যাপক ও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী। অন্যদিকে ছাত্র পরিষদের ৫ দফা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যার সমাধানের লক্ষে পরিবেশ সৃষ্টির দাবী। তাই দেখা যায় যে এই উভয় দুই ৫ দফার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিরাট।

প্রসঙ্গত একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গোড়া থেকেই পার্বত্য জেলা পরিষদকে বর্জন করে আসছে। জুম্ম জনগণও এই পার্বত্য জেলা পরিষদ বর্জন করেছে। ফলে জেলা পরিষদ হয়ে পড়ে গণধিকৃত ও অগণতান্ত্রিক সামরিক জেনারেলদের চাপিয়ে দেয়া লেজুর দলের পরিষদ। অপরদিকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এই গণধিকৃত ও অগণতান্ত্রিক জেলা পরিষদ বাতিলের দাবী জানিয়েছে। তাদের এই দাবী জনসংহতি সমিতির জেলা পরিষদ বর্জনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্ভবতঃ এই সামঞ্জস্যতা হেতু গনধিকৃত ও সামরিক কর্মকর্তাদের পদলেহনকারী পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এবং সুবিধাবাদী; প্রতিক্রিয়াশীল, তুলা ও দালাল গোষ্ঠী পাহাড়ী ছাত্র পরিষদও পাহাড়ী গণ পরিষদকে তথাকথিত শান্তি বাহিনীর দোসর বলে আখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ করেনি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, ৫ দফা দাবীর বিরুদ্ধে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও তাদের মদত পুষ্ট কতিপয় নীতি বর্জিত ছাত্র এবং সরকারের সাম্প্রদায়িকতার পতাকাবাহী চাকমা সংসদ, মারমা সংসদ, ত্রিপুরা কল্যাণ পরিষদ সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাঞ্ছিত বেআইনী অনুপ্রবেশকারী সাম্প্রদায়িক ভূমি ডাকাত এক শ্রেণীর বাঙ্গালীরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। জেলা পরিষদ দাবীর প্রেক্ষিতে এসব সুবিধাবাদী, সরকারী লেজুর ও উচ্ছিষ্ট পোষ্যদের সবচেয়ে বেশী আঘাত লেগেছে। এ আঘাত সহ্য করতে না পেরে তারা দাঁত খিচিয়ে মুখ ব্যাদান করে বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়েছে। সর্বোপরি দল বেঁধে প্রদর্শন করেছে আত্ম প্রবঞ্চনার আক্রোশ মিছিল ও হরতাল।

৫ দফার পক্ষ ও বিপক্ষ বিতর্কের পর্যালোচনা

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবীর যৌক্তিকতা ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জেলা পরিষদ বাতিলের পক্ষে তারা যে সব যুক্তি বা জেলা পরিষদের ত্রুটি উল্লেখ করেছে সেগুলি অধিকতর যুক্তিসংগত বলে প্রতীয়মান হয়। এ পার্বত্য জেলা পরিষদের আরো যে সব সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি রয়েছে সে ব্যাপারে জনসংহতি সমিতিও ১৮-২-৮৯ ইং তারিখে এক বিবৃতি প্রদান করেছে। এসব ত্রুটি হেতু জেলা পরিষদকে জনসংহতি সমিতি সহ জুম্ম জনসাধারণ, ছাত্র শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি ও বিশ্বের গণতান্ত্রিক সমাজ জেলা পরিষদকে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রত্যেক উপজেলা সদরেও বিভিন্ন স্থানে জুম্মদেরকে জোর করে এনে জেলা পরিষদের স্বপক্ষে প্রচারণা চালানো হয়েছে। প্রহসনমূলক জুম্ম জনগণকে ধরে এনে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে। যেমন ২০-২১ শে জুন নানিয়াচর উপজেলার বড়াদমের ৩২ জন গ্রামবাসীকে ২৫শে জুন অনুষ্ঠিতব্য জেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোট দেয়ার জন্য জোর করে ধরে এনে নানিয়াচর আর্মি ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে মিস নিরবালা চাকমা (১৮) পীং রাজেশ্বর চাকমা ভোট কেন্দ্রে আগত বিবিসি সাংবাদিক মার্ক টালিকে বলে, তাদেরকে ভোট দিতে বাধ্য করার জন্য পাঁচ দিন আগে জোরপূর্বক ধরে এনে ক্যাম্পে রাখা হয়েছে! এই প্রহসনমূলক নির্বাচনে রাঙ্গামাটি জেলাস্থ বাঘাইছড়ি উপজেলার করেঙ্গাতুলী ক্যাম্পে ৩০/৪০ জন ও মারিশ্যা বি ডি আর ক্যাম্পে কাচালং কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের জুম্ম এইচ এস সি পরীক্ষার্থীদেরকে ভোট দেয়ার জন্য একইভাবে আটক রাখা হয়েছিল। এছাড়া এ জেলা পরিষদকে বর্জন করে ২০,০০০ (বিশ হাজার) জুম্ম জনগণ ভারতে আশ্রয় নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাবু উপেন্দ্র লাল চাকমা (এম পি বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা) জেলা পরিষদ নির্বাচন প্রাক্কালে ভারতে আশ্রয় নেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, 'বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের উপর অগণতান্ত্রিক ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থি পার্বত্য জেলা পরিষদ জোর করে চাপিয়ে দেয়। তাই জোর করে চাপিয়ে দেয়া জেলা পরিষদ বাতিলের দাবী গণতন্ত্রকামী জুম্ম জনগনের দাবী। সুতরাং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এই জেলা পরিষদ বাতিলের দাবী যুক্তি সঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়।

ত্রিশ পাতায়

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

২৯ পাতার পর

ছাত্রদের অন্যান্য ৪ টি দাবীও খুবই বাস্তব সম্মত। বিগত ২০ বৎসর যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামে যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে আসছে তা আজ বিশ্বে প্রমাণিত। আন্তর্জাতিক সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টে তার প্রমাণ মিলে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবী কোনভাবে অযৌক্তিক ও অমূলক নয়। আবার ছাত্রদের ৪র্থ দাবী ভারতে আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীদের দেশে ফেরত এনে পুনর্বাসনের দাবীর ব্যাপারে দেশবাশীর কারোর দ্বিমত থাকার কথা নয়। ৫ দফার সর্বশেষ দাবীটি—পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের বাস্তব সম্মত উপায়। তাই এ ব্যাপারে এরশাদপন্থী সুবিধাবাদীদের ছাড়া সকল ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত জুম্মদের মতৈক্য থাকার কথা।

৫ দফার সমর্থনকারীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ পুর্বক ৫ দফার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। অপরদিকে ঐ ৫ দফার বিরুদ্ধে যারা লড়েছেন তাদের বক্তব্য গতানুগতিক ভাবে জেলা পরিষদকে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন, স্বশাসন, শান্তি স্থাপন ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য তাঁদের এ যুক্তির পক্ষে তারা পার্বত চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের বাস্তব সম্মত কোন উন্নয়ন কার্যক্রম অথবা জেলা পরিষদের স্বশাসন ক্ষমতার আওতায় প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ বা আইনগত কার্যকারীতা দেখাতে পারেননি। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, স্বশাসন, শান্তি-স্থাপন প্রভৃতি অন্তসারশূন্য বুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। বলা বাহুল্য যে, বিরোধী বক্তারা তাদের বক্তৃতা ও বিবৃতির মূল লক্ষ্য ছিল পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ। তারা ছাত্রবৃন্দকে তথাকথিত চক্রান্তকারী, শান্তীবাহিনীর দোসর প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এক্ষেত্রে তারা ছাত্রদের দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণ করার প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে বিদ্বেষ প্রসুত ও আক্রমনাত্মক দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিফলেটে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে কসুর করেননি। পার্বতীয় সম্পাদকীয়তেও একই সুর পরিলক্ষিত হয়েছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কতটুকু গোপালী গণ খী ও বাস্তব সম্মত তা বিবেচনা না করে ৫ দফার দাবী সমূহকে ভ্রান্ত, উদ্দেশ্য প্রণোদিত, বিভ্রান্তিকর, তাদের নিহিত স্বার্থ চরিতার্থের অপ-প্রয়াস, বানোয়াট, সাম্প্রদায়িক, জনসংহতি সমিতির অনুসারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বোপরি বিপক্ষ বক্তারা প্রহসন মূলক বিবৃতি ও মিছিলের আয়োজন করেছিল। এর প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, গত ১লা জানুয়ারী '৯১ইং তারিখে প্রকাশিত' 'সাপ্তাহিক পূর্বতাস' এ আনিসুর রহমান আলমগীর এর লিখিত "পাহাড়ী ছাত্রদের ৫ দফা বনাম পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি" নামক নিবন্ধে। এ নিবন্ধে লেখা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আবার প্রচার মাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে। এরশাদ সরকারের পতনের পর গত ১৯শে ডিসেম্বর ঢাকায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তাদের ৫ দফা দাবী নিয়ে সমাবেশ করে। পত্রিকাগুলো পরদিন সমাবেশের সংবাদ ছাপে-এটুকুই। কিন্তু ঘটনায় তোলপাড় উঠে পার্বত্য চট্টগ্রামে। হরতাল পালিত হয়, পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ আরো বিস্তৃত এবং রহস্যময়।

নিবন্ধের দ্বিতীয় প্যারায় ছাত্রদের ৫ দফার বিবরণ দেয়া হয়। পরবর্তী প্যারাগুলোতে লেখা হয়—পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দাবীগুলোর সাথে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য একাত্মতা ঘোষণা করে। তবে সংসদে তিনটি আসন সংরক্ষণের দাবীটি পুরণের জন্য সংবিধানে সংশোধনী আনা প্রয়োজন বিবেচনা করে ছাত্র ঐক্য এ বিষয়ের বিবেচনার ভার আগামী সংসদের কাছে হস্তান্তরের পক্ষে মতামত রাখে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তাদের ৫ দফা দাবী ঘোষণা করলে এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তিনটি পার্বত্য জেলায়। জানা গেছে একটি 'বিশেষ মহল' এতে ক্ষিপ্ত হয় সবচেয়ে বেশী। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ ঐ মহলের যোগসাজসে "খাগড়াছড়ি জেলা কল্যাণ পরিষদ" নাম দিয়ে ছাত্রদের দাবীর প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করে। অবাক বিষয় একটা গোষ্ঠীর দাবীর বিরোধীতা করে অন্যদের হরতাল পালন। সরকারী প্রচার মাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে এ হরতালের সংবাদ প্রচারিত হয়। অথচ ৫ দফা দাবী নিয়ে পাহাড়ী ছাত্রদের সমাবেশের কথা প্রচারিত হয়নি বেতার টিভিতে। এর পেছনে যে একটা বিশেষ মহলের হাত রয়েছে তা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠে ২৫ শে ডিসেম্বর ৫ দফা দাবীর বিরোধীতা করে ঢাকার সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদটি টিভি, রেডিওতে গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হওয়ায়।

এক ত্রিশ পাতায়

ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ

৩০ পাতার পর

জানা যায় ২৪শে ডিসেম্বর ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন এবং সেদিনের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি থেকে ৭ বাস লোক আনা হয়। এদের অধিকাংশ ছিল অউপজাতি। এ উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাদের বাজেট প্রায় ২ লক্ষ টাকা। ২৪ তারিখ তারা ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দের সাথে এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের পর বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করবে এ উদ্দেশ্যে প্রেসক্লাবেও যোগাযোগ করে। ২৪ তারিখ তাদের কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধি যায় ডাকসু ভবনে ছাত্র নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। ৫ দফার কেন বিরোধিতা করছে এবং ছাত্র ঐক্যের সাথে যোগাযোগ না করে (যেহেতু ছাত্র ঐক্য ৫ দফা দাবীকে সমর্থন জানিয়ে) কেন হরতাল পালন করে ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ জানতে চাইলে তারা কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। ছাত্র নেতারা আগত কয়েকজন পাহাড়ী ছাত্রের সাথে কথা বললে তারা জানায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে ঢাকায় আনা হয়েছে।

২৫শে ডিসেম্বর সাড়ে ১২ টায় ৫ দফার বিরোধীতা করে খাগড়াছড়ি জেলাপরিষদের নামে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরেন জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল ওয়াদাদ ভুঁইয়া। তিনি নিজেকে খাগড়াছড়ির বি, এন, পি-র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবেও পরিচয় দেন। একটি সুত্র জানায়, তিনি আসলে জাতীয় পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট। ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্ব্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য জাতীয় পার্টির মনোনয়ন চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। তার আসল বাড়ী নোয়াখালী জেলার (বর্তমান ফেনী) শুভপুর।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদ্বয় যথাক্রমে শ্রীসমীরণ দেওয়ান ও শ্রীগৌতম দেওয়ান এদিন ডাকসু ভবনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নের্তৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ও জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যানদ্বয় ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করেননি এবং সাংবাদিক সম্মেলনেও উপস্থিত হননি। প্রকৃত ব্যাপারটা হচ্ছে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফার বিরুদ্ধে যুক্তি সংগত বক্তব্য তুলে ধরার অক্ষমতা ও আকাঙ্খা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ ও পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের বিরোধীতার ভয়ে তাঁরা ডাকসু ভবনে আসেনি ও সাংবাদিক সম্মেলন করতে সাহস করেননি।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অত্যন্ত বাস্তব সম্মতভাবে তাদের ৫ দফা দাবী নামা উত্থাপন করেছে। বস্তুত তাদের দাবী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রাণের দাবী ও বিরাজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের দিক নির্দেশনা। তাই এই ৫ দফা দাবী পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণ রাজনৈতিক, ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবি ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এই ৫ দফার সকল রকম বাস্তবতা ও যৌক্তিকতাকে উপেক্ষা করে সুবিধাবাদী এক বিশেষ মহল এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা সভাসমিতি বিবৃতি ও প্রহসনমূলক মিছিলের মাধ্যমে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এটা আরও দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ৫ দফার বিরোধীতা সেই বিশেষ মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যারা সেটেলার্মী অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখল করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে পরিকর, যারা স্বৈরাচারী সরকারের দোসর ও সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দালাগোষ্ঠী নামে জুম্ম জনগণের নিকট পরিচিত। বলাবাহুল্য, এই গোষ্ঠী নিজেদের হীন স্বার্থ সিদ্ধি, চাল-গম-ডালের ভাগাভাগি ও গাছ-বাঁশের পারমিট করার জন্য এতদিন জুম্ম জনগনের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে আসছে। সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় কথাকথিত উন্নয়ন, শান্তি স্থাপন, স্বশাসন প্রভৃতি অন্তসারশূন্য বুলি তোতা পাখির মত আউড়িয়ে যাচ্ছে। এবং সাথে সাথে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদকে তথাকথিত বিভ্রান্ত, চক্রান্তকারী ও শান্তি বাহিনীর দোসর বলে নিজেদের চরম বিদ্বেষ, আক্রোশ ও দালালীর হীন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত ওসমানীর বিবৃতির প্রত্যুত্তর

৩য় পাতার পর

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেই সাথে এটাও জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন হচ্ছে সর্বপ্রথম সেই অনুসন্ধানী কমিশন যেটা সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধান ছাড়া বাধাহীনভাবে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে।

(৩) বাংলাদেশ প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, ডঃ আর এস দেওয়ানের দাবীকৃত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার শোভা চাকমার সাথে ফার ইষ্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ এর প্রধান সম্পাদক মিঃ ডেরেক ডেভিস এর সাক্ষাতের পর ডঃ আর এস দেওয়ান এর দাবী মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। ত্রিপুরার শরনার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের সময় এ শোভা চাকমার সাক্ষাতকার গ্রহণ, তার ব্যক্তিগত প্রামানিক দলিল ও অন্যান্য শরণার্থীদের লিখিত ও ব্যক্তিগত সাক্ষ্যদানের প্রেক্ষিতে ডঃ দেওয়ানের দাবীকৃত শোভা চাকমা যে ভারতের শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করছে সেই ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে যে মিঃ ডেরেক ডেভিস সরকারী কর্ম কর্তাদের দ্বারা ভুলভাবে পরিচালিত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে কমিশন এরূপ অনেক বিষয়ের উপর অনুসন্ধান চালিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, গ্রামে অগ্নিসংযোগ, আইনের অপব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কমিশন নিখুঁত অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সবের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রমাণিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন বাংলাদেশ সরকারের লিখিত বিবৃতিতে ব্যবহৃত ভাষার নিন্দা করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আশা করে যে, বাংলাদেশ সরকার তাদের রিপোর্টকে আক্রমন হিসেবে মনে করবে না। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশ তাদের রিপোর্টকে আক্রমন হিসেবে মনে করেছে। বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার কমিশনের রিপোর্টটি ভাল ভাবে না পড়ে এর বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আশা করে যে, তাদের রিপোর্টটি ভালভাবে অনুধাবন করে রিপোর্টের সুপারিশমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবেন।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে জুম্ম জনগনের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের রিপোর্ট "Life is not ours" প্রকাশিত হয় গত মে মাসে। এ রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন জুম্ম জনগনের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন জাজ্বল্য প্রমাণ উপস্থাপিত করে। বিশ্বের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের নিকট এ রিপোর্ট বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বাংলাদেশ সরকারের জঘন্য মনোভাব ও নিষ্ঠুরতা তাদের নিকট পরিস্ফুত হয়ে উঠে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও বিশ্ব আদিবাসী বিষয় ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রভৃতি মানবতাবাদী সংগঠন জুম্ম জনগনের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধির বিবৃতি

৩য় পাতার পর

the same people although there are regional specialities) তিনি অভিযোগ করে বলেন, যারা ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ উন্নতির সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারেনি তারাই বাংলাদেশের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য এই বিভ্রান্তি ও মিথ্যা অভিযোগ করে চলেছেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উত্তরণ ও গত সংসদীয় নির্বাচনের প্রেক্ষিতে বলেন, গত নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তিন বিরোধী দলীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাই বাংলাদেশের জাতীয় ধারার সাথে পার্বত্য বাসীদের সম্পৃক্তির ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশী কি উদাহরণ থাকতে পারে ?

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের প্রকাশিত চূড়ান্ত রিপোর্ট 'Life is not ours' এর উল্লেখ করে বাংলাদেশ প্রতিনিধি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণার অভাব হেতু রিপোর্টকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, এই রিপোর্ট প্রকাশ করার আগে নিয়ম মাফিক বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে কোন পরামর্শ করা হয়নি। তাই কমিশনের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক ভাবে প্ররোচিত না হলেও পক্ষপাতিত্বমূলক ত্রুটি পূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন সদস্যদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, তারা বাংলাদেশ সরকারের বিদ্রোহী বাহিনী কর্তৃক ভ্রান্ততথ্যে প্ররোচিত যা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। তিনি এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যাল, মানবাধিকার বিষয়ক আমেরিকার রাষ্ট্রীয় বিভাগের সাম্প্রতিক রিপো-

তেত্রিশ পাতায়

বাংলাদেশে স্থায়ী প্রতিনিধির বিবৃতি

৩২ পাতার পর

টের প্রেক্ষিতে কমিশনের রিপোর্টকে ভুল বলে প্রত্যাখান করেন।

মানুষের বাঁচার অধিকারের আলোকে বাংলাদেশের সমুদ্র বিধৌত নিম্নাঞ্চল থেকে উচ্চতর কম ঘনবসতিপূর্ণ পাহাড়ীয়া অঞ্চলে বাঙ্গালীদের স্থানান্তর ও পুনর্বাসনকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি মানবিক অধিকার বলে উল্লেখ করেন। যেহেতু আইনানুসারে বাংলাদেশের যে কোন মানুষ যে কোন স্থানে স্থানান্তর ও বসবাসের অধিকার।

বাংলাদেশ প্রতিনিধি পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ হচ্ছে বলে স্বীকার করেন এবং এসবের জন্য তিনি শান্তিবাহিনীকে দায়ী করেন। এই শান্তিবাহিনীর অত্যাচার ও নিপীড়ণের ফলে নিজ বাস্তুভিটা হতে উচ্ছেদ হওয়া ও বাংলাদেশে ফেরত আসা উদ্বাস্তুদেরকে পাঁচ একর জমি ও নগদ টাকা প্রদান করে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত পার্বত্যবাসীদের সত্তা বলার আতঙ্ককে তিনি শান্তি বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট বলে মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে আইনের চোখে সবাই সমান এবং নাগরিকদের ভূমি-অধিকারের উল্লেখ করে তিনি বলেন, পার্বত্যবাসীরা এসব অধিকার সমানভাবে ভোগ করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের গৃহীত গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচীর যৌক্তিকতা প্রদান করে তিনি বলেন উপজাতীয়দের যাযাবরত্ব ঘুচানো, জুম চাষের ফলে প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অতিরিক্ত সামরিক বাহিনী উপস্থিতির কমিশনের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বিবৃতিতে বলা হয় যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ দমন ও বেসামরিক সরকারী শাসনে সহায়তা করার জন্য সেখানে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন। পার্বত চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা বাংলাদেশ বিরোধী বাহিনী কর্তৃক সকল প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত। বাংলাদেশ সরকার বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সহিত বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলেও শান্তিবাহিনী তাতে রাজী হচ্ছে না।

মিঃ আর, এস. দেওয়ান সহ তিন জনের উপস্থাপিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি আরো বলেন, পার্বত চট্টগ্রামে তেরটি উপজাতি বাস করলেও জুম্ম নামে সেখানে কোন উপজাতি নেই। ফার ইষ্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ এর প্রধান সম্পাদক মিঃ ডেরেক ডেভিস এর ২৩ ৩ ৮৯ ইং তারিখে লিখিত নিবন্ধে মিঃ আর, এস, দেওয়ানের প্রকৃত পরিচয় জানা যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মিঃ আর, এস, দেওয়ানের উদ্ধৃত জনৈক নিহত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী শোভা চাকমার আহত হওয়া ও ত্রিপুরার আশ্রয় গ্রহণের দাবীকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করেন।

১১ পৃষ্ঠা সম্বলিত বিবৃতিটি বাংলাদেশের প্রতিনিধি সম্মেলনে পাঠ করেন। সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও ডঃ আর, এস. দেওয়ান সহ তিন জন জুম্ম নেতা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধির উল্লেখিত অযৌক্তিক ও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক বিবৃতির প্রেক্ষিতে ডঃ আর, এস. দেওয়ান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যবৃন্দ মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। বস্তুতঃ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির এই বিবৃতি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের চূড়ান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণকে অস্বীকার করার বিভ্রান্তমূলক এক বিবৃতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত এবং এই রিপোর্টের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বের মানবতাবাদী ব্যক্তি ও সংগঠনের কারোর সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত দশ ভাষাভাষী উপজাতিরা যে সমষ্টিগতভাবে আজ জুম্ম নামে বিশ্বে পরিচিত, তা জেনেশুনে অস্বীকার করে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আর ডঃ আর, এস, দেওয়ান সম্বন্ধে তিনি ফার ইষ্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ এর প্রধান সম্পাদক মিঃ ডেরেক ডেভিসের প্রবন্ধ উল্লেখ করে ডঃ আর, এস. দেওয়ানের উল্লেখিত শোভা চাকমা আহত ও ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনাকে মিথ্যা বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন, এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি ও নিজের চাকুরী বজায় রাখতে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুত করে দেওয়া মিথ্যা বিবৃতি পাঠ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারন মিঃ ডেরেক ডেভিসকে দেখানো শোভা চাকমা যে প্রকৃত শোভা চাকমা নয়, তা অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছে, আনন্দ বাজার পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকসহ বিভিন্ন সাংবাদিকের উপযুক্ত প্রমাণে। ডঃ আর এস দেওয়ানের উল্লেখিত সেই প্রকৃত শোভা চাকমা ও তার পিতা সেই ঘটনায় আহত হয়ে আজ যে ত্রিপুরার করবুক শিবিরে অবস্থান করছে এটাই সত্য, এটাই বাস্তব। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যবৃন্দ করবুক শিবিরে পরিদর্শনের সময় সেই প্রকৃত শোভা চাকমার সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছেন এবং প্রকৃত শোভা চাকমা হিসাবে প্রমান হাজির করেছেন তাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে।

সর্বোপরি বাংলাদেশ প্রতিনিধির ঘোষনাটি We are one and the same people, all thought there are regional specialities স্মরন করিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঘোষনাকে " বাংলাদেশে যারা বাস করে তারা সবাই বাঙ্গালী " বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধির এই বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্বাতন্ত্রতাকে অস্বীকার ও তাদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনকে ধামাচাপা দিতে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধ পরিকর। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টকে নির্লজ্জভাবে অস্বীকার ও বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যার বেসাতি পূর্ণ এ বিবৃতি তাই প্রমান করে।

সম্পাদকীয়

২য় পাতার পর

বর্তমান ক্ষমতাসীন গণতান্ত্রিক বি এন পি সরকারও পূর্বসূরীদের মত কি একই পথে একই নীতি অনুসরণ করে চলবেন?

এক্ষেত্রে জুম্ম জনগণ মনে করে বর্তমান ক্ষমতাসীন বি এন পি সরকার বাংলাদেশের সবচেয়ে বৈধ ও গণতান্ত্রিক সরকার। তা ছাড়া বাংলাদেশ সরকার আবার জনগণের কল্যানার্থে রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতন্ত্র থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে এসেছে। তাই পূর্বতন সামরিক জেনারেলদের পদাংক অনুসরণ বি এন পি সরকার করতে পারে না। তাহলে কি এই সরকার সত্যিকারভাবে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন? পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ অন্ততঃ তাই কামনা করে।

মিজোরামের চাকমা নেতৃবৃন্দ

৩য় পাতার পর

মিজোরামের চাকমা নেতৃবৃন্দ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের দুর্দশা বর্ণনা করে ৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত এক স্মারকলিপি এবং ৮টি দেশের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব নিয়ে গঠিত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার বিষয়ে অনুসন্ধানকারী পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের ১২৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত অনুসন্ধানের চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রধান মন্ত্রীর নিকট পেশ করেন।

তাঁদের স্মারকলিপিতে বলা হয়, বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন উপজাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯০০ সালের শাসনবিধি অনুসারে শাসন বহির্ভূত এলাকা হিসাবে বৃটিশ আমলে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে শাসিত অঞ্চল ছিল। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এই শাসনবিধি বলবৎ ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই শাসন বিধিকে প্রত্যাহার করলে উপজাতীয়রা তাদের জাতীয় অস্তিত্ব, সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ভাষা ও ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করে, যা উপজাতীয়দের স্বশাসন প্রদানে অপর্যাপ্ত। তদুপরি বাংলাদেশ সরকার সমতল জেলা থেকে লক্ষ লক্ষ বহিরাগতকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুণর্বাসিত করে উপজাতীয়দেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে অতিরিক্ত সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে জুম্ম জনগণের উপর ধর্ষণ, হত্যা অত্যাচার জেল জুলুম, ভূমিবেদখল ও ধর্মীয় পরিহানী ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলছে। সেখানে জুম্ম জনগণ সকল প্রকার নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীরা সেখানে ধর্মীয় মন্দির, গীর্জা ও দেবদেবীর মূর্তিগুলিকে ধ্বংস করছে। এরূপ ভূমিবেদখল, জাতি হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অগ্নিসংযোগের ফলে প্রায় ৭০ (সত্তর) হাজার জুম্ম ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে স্মারকলিপিতে জুম্মদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজস্ব শাসনতন্ত্র সহ স্বায়ত্বশাসন প্রদানের সুপারিশ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে স্মারকলিপিতে ৫টি দাবী পেশ করা হয়। দাবীগুলি হচ্ছে—(১) জুম্মদের উপর সকল প্রকার অত্যাচার নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধ করা, (২) জুম্মদেরকে পুণর্বাসনের নামে আদর্শগ্রাম, যুক্তগ্রাম ও মৌখ খামারে বসবাসের কর্মসূচী বাতিল করা, (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামে বে-আইনী অনুপ্রবেশ, বহিরাগত কর্তৃক জমি ক্রয়, ভূমি বেদখল, স্থায়ী বসতি বন্ধ করা, (৪) জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা ও (৫) বেদখলকৃত ভূমি হতে অউপজাতীয়দের প্রত্যাহার ও অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া।

স্মারকলিপিতে উপরোক্ত দাবীসমূহ পূরণ এবং মানবিক দৃষ্টি কোণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের বিরাজমান সমস্যার সমাধানের আন্তরিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট চাকমা নেতৃবৃন্দ আবেদন জানান।

এ চারজন চাকমা নেতা হচ্ছেন- শ্রী নিরুপম চাকমা মিজোরামের পরিবহন বিষয়ক মন্ত্রী, শ্রী হরি কিষ্ট চাকমা, মিজোরামের এম এল এ, শ্রীপুলিন বয়ন চাকমা, মিজোরামের স্বশাসিত চাকমা ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের প্রধান কার্যকরী সদস্য, শ্রী আদি কানু তঞ্চংগ্যা, চাকমা জেলা কাউন্সিলের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সহসভাপতি।

জুম্মদের উপর নগ্ন হামলা

১ম পাতার পর

ক্যাম্পগুলির অবস্থান। গত ২১শে আগষ্ট বুধবার ছিল হাটের দিন। বাজারটি উপজেলার প্রধান ব্যবসায়িক কেন্দ্র হেতু উপজেলার প্রতিটি অঞ্চল থেকে জুম্মরা এখানে বাজার করতে আসে। তাই স্বাভাবিকভাবে এই দিনে প্রতিটি অঞ্চল হতে শত শত জুম্ম তাদের মালামাল বিক্রিও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে বাজারে এসেছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস অর্ধ শতাধিক জুম্মকে এ দিন বাঙ্গালীদের সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়তে হয়েছিল। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে যে, এদিন দুপুর ১২ টায় হঠাৎ করে মুসলমান ভিডিপি ও কয়েক শত বাঙ্গালী বাজারটি ঘেরাও করে ও মালামাল ক্রয় বিক্রয়ে রত জুম্মদের উপর একচেটিয়া হামলা চালায়। এই হামলায় জুম্মদের নারী শিশু ও বৃদ্ধ কেউই বাদ পড়েনি। মুসলমান বাঙ্গালীর ভিডিপিদের সহযোগে লাঠি, বল্লম, দা, কুড়াল প্রভৃতি নিয়ে চাকমাদেরকে একচেটিয়া আক্রমন ও তাদের গরু, ছাগল, চাউল, তরকারী প্রভৃতি মালামাল, টাকা পয়সা সবই লুটপাট' করে নেয়। মুসলমানরা যাকে যেখানে পেয়েছে তাকে সেখানে আক্রমণ করেছে। জুম্মরা এই হামলার প্রতিরোধ করতে পারেনি। কারণ তারা মুসলমানদের তুলনায় সংখ্যায় অল্প ও অপ্রস্তুত ছিল। অন্যদিকে বাঙ্গালীদের পক্ষে আনসার পুলিশ, বি ডি আর ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমর্থন ও উস্কানী ছিল। তাই অসহায় ও নিরস্ত্র জুম্ম জনগণ সর্ব রকম আক্রমণের শিকার হয়। বাঙ্গালী মুসলমানেরা তাদের মালামাল ও টাকা পয়সা সবই লুট করে ছিনিয়ে নেয়। অনেক অসহায় জুম্ম পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হলেও একজন নিহত ও অর্ধ শতাধিক জুম্ম এ হামলায় গুরতর ভাবে আহত হয়। নিম্নে তাদের কয়েক জনের বিবরণ দেয়া গেল ঃ

১। শ্রী শিশু ময় চাকমা (১১) পীং বসন্ত কুমার চাকমা নিহত, ২। মনিকা চাকমা (১৬) পীং মনিন্দ্র লাল চাকমা, ৩। গণিত চাকমা (৩০) পীং শুক্রমনি চাকমা ৪। শ্রী বসন্ত কুমার চাকমা, (৪০) পীং চন্দ্র কুমার চাকমা ৫। শ্রী পরিমল চাকমা (২৬) পীং বীরেন্দ্র লাল চাকমা-

জুম্ম প্রতিনিধি দল

১ম পাতার পর

জুম্ম প্রতিনিধিবৃন্দ আরো বলেন, সম্প্রতি জুম্ম ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নিকট জুম্ম জনগণের ৫ দফা দাবীনামা পেশ করে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দাবীগুলি পুরণে অস্বীকার করেন।

বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে। ফলে ভারতে আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারছেনা। এ ছাড়া ঘুর্ণিঝড়ে জুম্মদের ৯৫% ঘড়বাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া সত্বেও জুম্ম জনগণ তেমন কোন সাহায্য পায়নি।

পরিশেষে জুম্ম প্রতিনিধিবৃন্দ জুম্ম শরণার্থীদের নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, জুম্ম জনগনকে রক্ষার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সুপারিশ সমুহ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘের নিকট আবেদন জানান।

এ জুম্ম প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীসঞ্জীব চাকমা, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র চাকমা ও শ্রী রামেন্দু শেখর দেওয়ান।

৬। শ্রী তরুন চান চাকমা (২৫) পীং রেবতী রঞ্জন চাকমা ৭। শ্রী পূর্ণলাল কার্ব্বারী (৬০) পীং দয়া মোহন চাকমা ৮। শ্রী নিহার কান্তি চাকমা (১৪) পীং পুন লাল কার্ব্বার ৯। শ্রী পরান ধন চাকমা ১৩) পীং ? ১০। শ্রী প্রিয় ময় চাকমা ১৪) পী ? ১১। শ্রী কনারাম চাকমা (৪২) পী রজনী কুমার চাকমা, ১২। শ্রী লাল চাকমা ৪৫) পী আনন্দ চাকমা, ১৩। শ্রী চির জ্যোতি চাকমা (৫০) পীং হেমন্ত লাল চাকমা, ১৪। জয় স্মৃতি চাকমা (২০) পীং রাজ সিংহ চাকমা, ১৫। শ্রী ইন্দ্র মোহন চাকমা (৪২) পীং জয় কিষ্ট চাকমা, ১৬। কুমারী কনিকা চাকমা ১৭। পীং অনন্তমনি চাকমা, (১৭) শ্রী লেজথুলা চাকমা ২২) পীং মায়া লাল চাকমা, ১৮। শ্রী বিজে চাকমা (২৭) পীং চন্দ্র শেখর চাকমা, ১৯। শ্রী সোনা মনি চাকমা (২৭) পীং সরোজ কুমার চাকমা, ২০। শ্রী সুনয়ন চাকমা (১৭) পীং বর্ণ লাল চাকমা ২১। শ্রী শান্তি কুমার চাকমা পীং সুরেজ

ছয়ত্রিশ পাতায়

জুম্মদের উপর নগ্ন হামলা

৩৫ পাতার পর

চন্দ্র চাকমা, ২২। শ্রী নন্দ দুলাল চাকমা (৬৫) পীং মৃত ভাজা চাকমা, ২৩। শ্রী কুক্যাশ্রী চাকমা, (৬০) পীং চেবেদা চাকমা, ২৪। শ্রী সোনারাম চাকমা (২৮) পীং নরেশ চন্দ্র চাকমা, ২৫। শ্রী মতি লাল চাকমা (৫৫) পীং (২৬) শ্রী মহারাজ চাকমা (৪৫) পীং মজাগালা চাকমা।

উপরোক্ত জুম্মরা মুসলমানদের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং মারিশ্যা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। জানা গেছে, মোট ৫৭ জন জুম্মকে মারিশ্যা হাসপাতালে ও চট্টগ্রামে চিকিৎসা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভি ডিপিদের সহযোগে মুসলমানেরা এ ঘটনার আগে আরো দু'বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়েছিল। ১৯৮৬ সালের ৮ই জুলাই তারিখে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমান বাঙ্গালীরা তুলাবান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীঅম্বরিশ চাকমা সহ ১৫ জন জন জুম্মকে হতাহত করে। এদিন মোঃ শামসুল হুদাও মোঃ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে এক-দল ভিডিপি ও মুসলমানেরা উগলছড়ি গ্রামে আক্রমন চালিয়ে উগলছড়ি (নিউ লাল্যাঘোনা) নব জ্যোতি বিহা-রাধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রজ্ঞা সারা ভিক্ষু সহ কয়েকজন জুম্মকে হতাহত ও বিহারের পবিত্র বৌদ্ধ মুর্তি ভাংচুর করে। এছাড়া ১৯৮৮ সালের ৮—১০ই আগষ্ট মুসলমানদের দ্বারা বাঘাইছড়ি গণহত্যা সংঘটিত হয়। এ গণহত্যায় শিজক, সার্বোয়াতুলি, খাগড়াছড়ি এলাকায় ঘটনাস্থলে ১২ জন নিহত, ২১ জন আহত ও ২৩ জন জুম্ম নিখোঁজ হয়। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া জুম্মদেরকে আর্মিরা ধরে নিয়ে আমতলীস্থ অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের নিকট হস্তান্তরিত করে এবং অনুপ্রবেশকারীরা তাদেরকে কুপিয়ে হত্যা করে। এছাড়া মারিশ্যা হেডকোয়ার্টারে ভিডিপিদের সহযোগে মুসলমান বাঙ্গালীরা আক্রমণ চালিয়ে বাঘাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান শ্রী লক্ষী কুমার চাকমা, কাচালং কলেজের ২ জন শিক্ষক সহ কলেজ ও স্কুলের ছাত্র, সরকারী কর্মচারী ও সকল জুম্মদেরকে হতাহত করেছিল।

এ ঘটনার পরদিন সেনাবাহিনীর উদ্যোগে মারিশ্যায় এক প্রহসনমূলক শান্তি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি রিজিয়ন কমান্ডার আহসান নাজমুল আমিন, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান, কতিপয় জেলা পরিষদ সদস্য-পারি জাত কুসুম চাকমা, মওলানা মোঃ শহীদুল্লাহ, উদয়রবি চাকমা, জ্ঞানদা বিকাশ চাকমা, মারিশ্যা ক্যাম্পের সি ও কাউন্সী রাব্বী রুমী ও বাঘাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান লক্ষী কুমার চাকমা। এ সম্মেলনে স্থানীয় জুম্ম নেতৃবৃন্দ জুম্মদের উপর মুসলমান বাঙ্গালীদের আক্রমনের ভয়াবহতা তুলে ধরেন। অন্যদিকে রাঙ্গা-মাটি থেকে আগত বক্তারা মারিশ্যা বাজারে ঘটনার জন্য শান্তি-বাহিনীকে দায়ী করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে শান্তিবাহিনীর কার্যকলাপের সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য সম্মেলন প্রাকালে অনেক জুম্মকে জোর করে সম্মেলনে যেতে বাধ্য করা হয়। মূল সমস্যার আলোচনা ব্যতিরেকে এই প্রহসন-মূলক সম্মেলনের অপ্রাসংগিক আলোচনায় জুম্ম জনগণ সন্তুষ্ট হতে পারেনি বলে জানা গেছে।

—

ভুল সংশোধন

জুম্ম সংবাদ বুলেটিনের ৩য় সংখ্যায় মুদ্রন প্রমাদবশতঃ কিছু শব্দ বাদ পড়েছে। সেগুলো সংশোধন করা হল।

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	শব্দ		পরের শব্দ
৭	১	৩১	৩ জনকে	(এর পরে হবে)	রেখে ১৪ জনকে
১২	২	২৩	উচ্ছেদ	(„)	কার্যক্রম
১৬	২	৬	পরিষদের	(„)	চেয়ে আরো অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ

এ ছাড়া ১৫ নং পৃষ্ঠার ১ নং কলামের ২৩ নং লাইনের ও, সাংগঠনিক কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপেইন' শব্দগুলো বাদ দিয়ে পড়তে হবে।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারনা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।